Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইসলামফোবিয়া- কারন,প্রভাব ও প্রতিরোধ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: মোহসেনা বেগম

রোলঃ ২৩১০০১২০৬৯০


৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইসলামফোবিয়া- কারন,প্রভাব ও প্রতিরোধ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: মোহসেনা বেগম

রোলঃ ২৩১০০১২০৬৯০

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামফোবিয়া- কারন,প্রভাব ও প্রতিরোধ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: মোহসেনা বেগম, আইডিঃ ২৩১০০১২০৬৯০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামফোবিয়া- কারন,প্রভাব ও প্রতিরোধ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

**মোছা: মোহসেনা বেগম**

আইডিঃ ২৩১০০১২০৬৯০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

# সূচিপত্র


ভূমিকা (Introduction):........................................5
**ইসলামোফোবিয়া:........................................6
***শব্দটির উৎপত্তি ও বিবর্তন:........................................7
***কেন এই বিষয়টি আজ বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ?........................................9
মূল থিসিস বক্তব্য (Thesis Statement):........................................10
*গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি :........................................11
***অধ্যায় -১........................................13
***অধ্যায় -২........................................18
***অধ্যায় ৩:........................................39
***অধ্যায় -৪........................................62
*** উপসংহার ও উত্তরণের পথ (Conclusion and Solutions):........................................73

# ✐ ভূমিকা (Introduction):

***কুরআনের আলোকে (সূরা আস-সাফ ৬১:৮)
***يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الdo ْكَافِرُونَ َ***

"তারা আল্লাহর আলোকে তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ আল্লাহ তাঁর আলো পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"

***হাদিস (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৫)
***إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ***

"নিশ্চয়ই ইসলাম শুরু হয়েছিল অপরিচিত হিসেবে এবং আবার অপরিচিত হয়ে যাবে, যেমনটি শুরু হয়েছিল। সুতরাং সুসংবাদ সেই অপরিচিতদের জন্য।"

## **ইসলামোফোবিয়া:

ইসলামোফোবিয়া নিছক কোনো ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়, বরং এটি একটি আধুনিক ও পদ্ধতিগত 'সাংস্কৃতিক বর্ণবাদ' (Cultural Racism)।
ক্রুসেড থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক আমল পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামকে সবসময় পশ্চিমা আধিপত্যের বিপরীতে একটি হুমকি বা "অন্য" (The Other) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

**মূল থিসিস বা প্রতিপাদ্য হলো: ইসলামোফোবিয়া কোনো আকস্মিক ভয় বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি মূলত রাজনৈতিক স্বার্থ, মিডিয়ার একপেশে প্রচার এবং পদ্ধতিগত বর্ণবাদের এক গভীর ফল, যা বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও মানবাধিকারকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তুলছে।
ইসলামোফোবিয়া’ শব্দটি। পরিভাষাটি বিশেষ করে ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে জনপরিসরে বেশি প্রচলিত হয়।
১৯৯৭ সালে ব্রিটিশ থিঙ্কট্যাঙ্ক রান্নিমিড ট্রাস্ট (Runnymede Trust) তাদের প্রতিবেদনে ইসলামোফোবিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে—ইসলামের প্রতি ভিত্তিহীন শত্রুতা, যার বাস্তব ফল হিসেবে মুসলিম ব্যক্তি ও কমিউনিটির প্রতি অন্যায্য বৈষম্য ইত্যাদি দেখা দেয়।

## ***শব্দটির উৎপত্তি ও বিবর্তন:

মনোবিজ্ঞানের "ফোবিয়া" সংজ্ঞা যদি দাঁড়ায় ভিত্তিহীন/অতিরঞ্জিত ভয়—তাহলে ইসলামী শরিয়াহর কিছু কঠোর বিধান, এবং অতীত ও সমসাময়িক উগ্রপন্থী সহিংসতার নজির পর্যালোচনার পর, ইসলামের প্রতি/ইসলাম-সম্পর্কিত কিছু আশঙ্কাকে কি সবক্ষেত্রে 'ভিত্তিহীন' বা 'অযৌক্তিক' বলা যৌক্তিক? নাকি এখানে "ফোবিয়া" এবং "ঝুঁকিভিত্তিক সতর্কতা"—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য টানার জন্য সমাজতাত্ত্বিক ও আইনি বিশ্লেষণ প্রয়োজন? এই বিভাজনটাই পরবর্তী আলোচনার ভিত্তি।

*শরিয়াহ আইনঃ রাষ্ট্রীয় ও আইনি কাঠামোর বিশ্লেষণ:
ইসলাম সম্পর্কে ভীতির ভিত্তি বুঝতে হলে এর আইনি কাঠামো বা শরিয়াহ ব্যবস্থার পর্যালোচনা অপরিহার্য। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'ভয়' তখনই অযৌক্তিক হয় যখন বিপদের কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকে না। কিন্তু ইসলামী বিধানে নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য যে দণ্ডবিধি নির্ধারিত আছে, তা কোনো কল্পনা নয় বরং সংহতিবদ্ধ আইনি বাস্তবতা।

*ধর্মত্যাগের শাস্তি (Apostasy/Irtidad):
ইসলামী আইনশাস্ত্রের (Fiqh) চারটি প্রধান মাজহাব—হানাফি, শাফি, মালিকি ও হাম্বলি—ঐকমত্য পোষণ করে যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কের পুরুষ যদি ইসলাম ত্যাগ করেন, তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সহিহ বুখারির (৯:৮৩:১৭) স্পষ্ট নির্দেশ: "মান বাদ্দালা দিনাহু ফাকতুলুহু" (যে তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো)। [1]

এই বিধানটি কেবল প্রাচীন ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান বিশ্বের অন্তত ১০ থেকে ১২টি দেশে (যেমন: সৌদি আরব, ইরান, আফগানিস্তান, মৌরিতানিয়া) ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান সংবিধানে বা দণ্ডবিধিতে বিদ্যমান। যখন একটি মতাদর্শ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ রক্তক্ষয়ী হয়, তখন সেই মতাদর্শ সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির মনে আতঙ্ক তৈরি হওয়া একটি সাধারণ জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া। একে 'অমূললক' বলা যুক্তিবিদ্যার পরিপন্থী।

*ব্লাসফেমি ও অবমাননার দণ্ড:

ইসলামে 'সাব্ব আল-রাসুল' বা নবীর অবমাননার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। ইবনে তাইমিয়াহ তার 'আস-সারিম আল-মাসলুল আলা শাতিম আর-রাসুল' গ্রন্থে বিস্তারিত প্রমাণ করেছেন যে, মুসলিম বা অমুসলিম যেই হোক না কেন, নবীর সমালোচনা করলে তার কোনো ক্ষমা নেই এবং তার শাস্তি মৃত্যু। পাকিস্তানের মতো দেশে ব্লাসফেমি আইনের অপপ্রয়োগ এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বাংলাদেশে এই কয়েকদিন আগেও একজন ব্যক্তিকে প্রথমে পিটিয়ে এরপরে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে দেয়া হয়। যখন কোনো ব্যক্তি দেখেন যে তার বাকস্বাধীনতা বা একটি সাধারণ সমালোচনা তার জীবনের জন্য চরম ঝুঁকি বয়ে আনছে, তখন সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে তার ভীতিটি হয় সম্পূর্ণ 'ক্যালকুলেটেড' বা হিসাবনিকাশ করা বাস্তব ভীতি। [2]

*ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক সহিংসতা:

মানুষের ভয় কেবল ধর্মগ্রন্থের ভাষ্য বা তাত্ত্বিক বিতর্ক থেকে তৈরি হয় না; অনেক সময় তা গড়ে ওঠে অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতা (empirical experience) থেকে—অর্থাৎ জনপরিসরে দেখা ঘটনাবলি, সহিংসতার নজির, এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ থেকে। গত কয়েক দশকে "ইসলাম রক্ষা", "ধর্মীয় অবমাননার প্রতিশোধ", কিংবা "জিহাদ"—এ ধরনের ভাষ্যকে কেন্দ্র করে সংঘটিত একাধিক আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের একটি অংশের মনে যে নিরাপত্তা-উদ্বেগ বা ভীতি তৈরি হয়েছে, তা নিছক ধারণা নয়; বরং ঘটনাবলির সঙ্গে যুক্ত পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রেক্ষিত আছে।

*সালমান রুশদি ও ফতোয়া সংস্কৃতি:

১৯৮৯ সালে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর পক্ষ থেকে সালমান রুশদির বিরুদ্ধে যে ফতোয়া জারি হয়, সেটি আধুনিক যুগে "ধর্মীয় সমালোচনা/সাহিত্য"কে কেন্দ্র করে সীমান্ত-অতিক্রমী (transnational) হুমকির একটি প্রতীকী উদাহরণ হিসেবে আলোচিত। ফতোয়ার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অভিঘাত ছিল এই যে—একজন লেখক পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন, তার লেখাকে "অপরাধ" হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে লক্ষ্যবস্তু করার নৈতিক বৈধতা নির্মাণের চেষ্টা করা হয়।

## ***কেন এই বিষয়টি আজ বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ?

১. সংজ্ঞা ও ধারণা:

আধুনিক বর্ণবাদ হিসেবে ইসলামোফোবিয়াধর্মীয় বিদ্বেষ বনাম বর্ণবাদ: ইসলামোফোবিয়াকে অনেকে কেবল মুসলমানদের বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা মনে করলেও, সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণবাদী রূপ [১]। এতে মুসলমানদের গায়ের চামড়ার রঙের পরিবর্তে তাদের সংস্কৃতি, পোশাক, ও ধর্মীয় প্রতীককে অবমূল্যায়ন করে নিকৃষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।সাংস্কৃতিক বর্ণবাদ: ইসলামকে একটি পশ্চাৎপদ ও সহিংস সংস্কৃতি হিসেবে চিত্রিত করে পুরো মুসলিম সম্প্রদায়কে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি আধুনিক হাতিয়ার।

২. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

'অন্য' হিসেবে বিবেচনার ইতিহাসক্রুসেডের প্রভাব: মধ্যযুগে ক্রুসেডের সময় থেকেই পশ্চিমা সাহিত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের পশ্চিমা সভ্যতার চিরন্তন শত্রু বা 'অপর' (The Other) হিসেবে দেখানোর বীজ বোনা হয়।ঔপনিবেশিক আমল: ১৮ ও ১৯ শতকে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের সময় প্রাচ্যবাদী (Orientalist) দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে অসভ্য ও বর্বর হিসেবে তুলে ধরা হয়, যা তাদের শাসনকে বৈধতা দিয়েছিল।

# মূল থিসিস বক্তব্য (Thesis Statement):

ইসলামোফোবিয়া কোনো স্বাভাবিক বা আকস্মিক ভয় নয়। এটি একটি সুপরিকল্পিত সামাজিক ব্যাধি যা রাজনৈতিক স্বার্থ বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ও ভূ-রাজনীতিতে ভোট ব্যাংক বা আধিপত্য ধরে রাখতে ব্যবহার করা হয়।মিডিয়ার ভূমিকা: সংবাদমাধ্যম ও পপ কালচারে মুসলমানদের নেতিবাচক ও সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করে সমাজে ভীতি ছড়ায়।মানবাধিকার লঙ্ঘন এই পদ্ধতিগত বর্ণবাদ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বাকস্বাধীনতা, কর্মসংস্থান ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে চরম হুমকির মুখে ফেলে মানবাধিকারকে বিপন্ন করছে। ইসলামোফোবিয়া

## *গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি :

কোনও সন্দেহ নেই শব্দটি বিতর্কিত, স্পর্শকাতর এবং অযথাযথ ব্যবহারের শিকার। মুসলমানেরা এই শব্দ বা ধারণাটিকে ব্যবহার করেছেন অবিবেচকের মতো, যথেচ্ছ ভাবে। তেমনি পশ্চিমা, ডানপন্থী মানুষেরা এমন কি মানবতাবাদী দাবী করা নব-নাস্তিকতাবাদী একটিভিস্টরাও এই ধারণাটির ব্যবহার করেছেন যথেচ্ছ ভাবে। নব-নাস্তিকেরা বলার চেষ্টা করেছেন সমাজে যে "ইসলামোফোবিয়া"র সৃষ্টি হয়েছে এটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, সারা দুনিয়াতে ইসলামিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গুলোর যে আতংকজনক তৎপরতা, তার ফলশ্রুতি হিসাবে পশ্চিমা জনগোষ্ঠীতে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক। আবার মুসলমান নাগরিকেরা কিম্বা ইউরোপে মুসলিম সংগঠনসমূহ তাদের সকল বঞ্চনাকেই "ইসলামোফোবিয়া" বলে চিহ্নিত করেতে চেয়েছেন যা হয়তো সকল ক্ষেত্রেই সঠিক নয়। সিরিয়াস গবেষকদের মাঝে বিরোধ আছে এই শব্দটির উপযুক্ততা নিয়ে। তাদের মাঝে মতবিরোধ আছে এই ধরণের বিদ্বেষ মূলক আচরণের পরিমান নিয়ে। কিন্তু একটি বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই, সেটা হচ্ছে মুসলমান জনগোষ্ঠীর দিকে তাক করা ঘৃণা, শারীরিক আক্রমন, ঘৃণাসূচক ভাষা, বাক্যের ব্যবহার ইত্যাদির উপস্থিতি এবং তার হার বৃদ্ধি নিয়ে। মুসলিম এবং অমুসলিম উভয় পক্ষের গবেষক, সমাজ বিশ্লেষক কিম্বা রাজনীতি ভাষ্যকারদের মাঝে ইসলামোফোবিয়া বা মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও সংস্কারাচ্ছন্ন আচরণের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি বিষয়ে কোনও মতবিরোধ নেই। ইউরোপ, আমেরিকার গবেষকেরা স্বীকার করেছেন গত তিন দশকে পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি ঘৃণা ও সাংস্কৃতিক বর্ণবাদের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

সাম্প্রতিক সময়ে "ইসলামোফোবিয়া" বিষয়ক আমার দুই একটি মন্তব্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমার বন্ধুদের কাছ থেকে বেশ আগ্রহউদ্দীপক কিছু মতামত পেয়েছি যা আমাকে এই লেখাটি লিখতে প্রেরণা দিয়েছে। আমি সমাজবিজ্ঞানী নই কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা আমাকে দারুন ভাবে টানে। "ইসলামোফোবিয়া" ধারণাটি নিয়ে আমার আগ্রহের প্রধান কারণ সম্ভবত সেটাই। এ সম্পর্কে সামান্য কিছু পড়াশুনার প্রেক্ষিতে আমার মনে হয়েছে, এই ধারণাটি নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে, বিশেষত ইউরোপে যে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক চলছে গত তিন দশক ধরে, তার ছিটেফোঁটাও

হয়নি আমাদের বাংলা ভাষায়। মুসলিমদের মাঝেতো নয়ই, এমন কি মুক্তচিন্তক দাবী করা মানুষদের মাঝেও তাই "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটির বোঝাপড়াগুলো দারুন ভাবে প্রাথমিক, খানিকটা বিভ্রান্তিমূলক ও অপ্রতিনিধিত্বশীল। এই লেখাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে বাংলা ভাষায় একটি গঠনমূলক আলোচনা শুরু করা।

এই বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে বেশ কিছু ভালো গবেষণা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। এই সকল গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন নামকরা জার্নালে এবং এঁদের কেউ কেউ তাদের গবেষণার ফলাফলকে পুস্তক আকারেও প্রকাশ করেছেন। এই সকল প্রকাশনা গুলোর মাঝে প্রবল আক্রমণাত্মক, পারস্পরিক দোষারোপ করে প্রকাশনা আছে আবার নিরেট একাডেমিক, গঠনমূলক ধারার প্রকাশনাও আছে। আমি চেষ্টা করেছি, এই লেখাটি তৈরীতে, পদ্ধতিগত ভাবে করা গবেষণা প্রকাশনা গুলোর সাহায্য নিতে এবং রাজনৈতিক ভাবে বায়াসড প্রকাশনাগুলোকে এড়িয়ে চলতে। পক্ষে বিপক্ষে উভয় ধরণের লেখালেখিকে পড়ার চেষ্টা করেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি।

বলাই বাহূল্য "ইসলামোফোবিয়া" এই শব্দটি যে প্রতিষ্ঠানটি সবচাইতে বেশী প্রচার করেছে ও বিখ্যাত করেছে, তারাও স্বীকার করেন এই শব্দটি "পারফেক্ট" বা একদম "যুতসই" শব্দ নয়। কিন্তু যে ঘটনা বা সামাজিক প্রপঞ্চ (Social Phenomenon) গুলোকে এই শব্দটি ব্যাখ্যা করে তার জন্যে শব্দটি যথেষ্ট বলে মনে করেন এঁরা। এই লেখাটিতে, আমি চেষ্টা করবো "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটিকে তার ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতিক প্রেক্ষিত থেকে তুলে ধরার জন্যে। চেষ্টা করবো "ইসলামোফোবিয়া" ধারণাটি নিয়ে একজন নাস্তিক ও মানবতাবাদী মানুষ হিসাবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার ।

# ***অধ্যায় -১

***কুরআনের দলিল (সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৩২)

***مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا***

"যে ব্যক্তি একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করল।"

***হাদিস (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১০)

***الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ***

"মুসলমান সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

***ইসলামোফোবিয়ার উৎস ও কারণ (The Roots of Islamophobia):

ইসলামোফোবিয়া (ইসলামভীতি ও বিদ্বেষ) মূলত একটি সুগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক মানসিকতা, যা বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত। এর প্রধান উৎস ও কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

*১. রাজনৈতিক এজেন্ডাবিশ্ব রাজনীতিতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখা এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বৈধ করার জন্য অনেক সময় পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামকে একটি আদর্শিক শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এটি সমাজে কৃত্রিম ভীতি তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের একটি সুপরিচিত হাতিয়ার।

*২. সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদপ্রাচ্যবাদ (Orientalism) এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মানসিকতা থেকে এই বিদ্বেষের জন্ম হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচ্যের (বিশেষত মুসলিম বিশ্বের) সংস্কৃতি ও ধর্মকে পশ্চাৎপদ বা 'অন্য' (Other) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ববোধকে উস্কে দেয়।

*৩. চরমপন্থা ও সাধারণীকরণখুবই নগণ্য সংখ্যক উগ্রবাদী বা সন্ত্রাসীর কর্মকাণ্ডের দায়ভার সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর (১.৮ বিলিয়ন) ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ইসলামোফোবিয়ার অন্যতম বড় কারণ। ব্যক্তিগত অপরাধকে পুরো ধর্মের লেবাসে প্রচার করার মাধ্যমে এই অযৌক্তিক ভীতি ও ঘৃণা ছড়ানো হয়।

*৪. মনস্তাত্ত্বিক কারণঅচেনা বা ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি মানুষের সহজাত ভয় বা আতঙ্ক (Xenophobia) এখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় এই স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বকে বিভিন্ন নীতি, গণমাধ্যম ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারণার মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়।বিশ্বজুড়ে এই বিদ্বেষ ও ভীতি মোকাবিলার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতি বছর ১৫ মার্চকে [ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আন্তর্জাতিক দিবস] হিসেবে পালন করে আসছে। ইসলামোফোবিয়ার গঠন ও ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে [রানিমেড ট্রাস্ট] (Runnymede Trust) এর গবেষণা প্রতিবেদনগুলো পড়া যেতে পারে।
ইসলামফোবিয়া—একটি গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, যা আজকের বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এক বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শব্দটির অর্থ হলো ইসলাম ধর্ম, মুসলমান জনগোষ্ঠী এবং তাদের সংস্কৃতির প্রতি ভীতি, ঘৃণা ও বৈরিতা। ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম হলেও, পশ্চিমা মিডিয়া এবং রাজনীতিবিদরা দীর্ঘদিন ধরে ইসলামকে সন্ত্রাস, সহিংসতা এবং পশ্চাৎপদতার সাথে সম্পৃক্ত করার অপচেষ্টা করে আসছে। ইসলামের উদারতা, বিজ্ঞানমুখী চিন্তাধারা এবং মানবিক মূল্যবোধকে আড়াল করে, কিছু গোষ্ঠী ইসলামকে একটি হুমকি হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছে। বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পরে, ইসলামফোবিয়ার মাত্রা ভয়াবহভাবে বেড়ে যায়। পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিম পরিচয়কে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু হয়; মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী, এমন ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হয় মিডিয়া ও একাডেমিক চর্চার মাধ্যমে। এই প্রবণতা কেবল ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ায়নি, বরং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ণ করেছে।

**ইসলামফোবিয়া: পশ্চিমা রাজনীতির হাতিয়ার:

ইসলামফোবিয়া কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ, যা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দীর্ঘদিনের এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কিছু প্রভাবশালী রাষ্ট্র, ইসলামী জাগরণ এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে নিজেদের আধিপত্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে। তারা মুসলিম দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন তেল ও খনিজ, দখল করতে এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে চায়। এজন্য মুসলিম জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরি, মুসলিম নেতৃত্বকে দুর্বল করা, এবং ইসলামের প্রকৃত রূপকে বিকৃত করে উপস্থাপন করাই তাদের কৌশল। মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের সন্ত্রাসবাদের সাথে জুড়ে দেওয়া, ইসলামিক আন্দোলনগুলোকে 'চরমপন্থী' বা 'বিপজ্জনক' তকমা দেওয়া, এবং ইসলামি আইন ও হিজাব-নিকাবের মতো বিষয়গুলোকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আখ্যা দেওয়া—এসবই এই ষড়যন্ত্রের অংশ। ফ্রান্সে হিজাব নিষিদ্ধ করা, ডেনমার্কে কোরআন অবমাননা, বা সুইডেনে মুসলিম অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা—all ইসলামফোবিয়ার প্রতিফলন, যা পশ্চিমা রাজনীতির উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ইসলামবিদ্বেষী শক্তির ইন্ধন জুগিয়েছে।

**মিডিয়া ও ইসলামফোবিয়া: মিথ্যা প্রচারের জাল:

ইসলামফোবিয়ার বিস্তারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে পশ্চিমা মিডিয়া। প্রিন্ট, টেলিভিশন, সিনেমা এবং অনলাইনে ইসলামবিরোধী প্রচার একটি নিয়মিত চর্চায় পরিণত হয়েছে। হলিউডের চলচ্চিত্রে মুসলিম চরিত্রদের প্রায়শই সন্ত্রাসী, কঠোর, নারী-নির্যাতক, কিংবা পশ্চাৎপদ হিসেবে দেখানো হয়। সংবাদমাধ্যমে কোনো সন্ত্রাসী হামলার পরপরই মুসলমানদের দোষারোপ করা হয়, যদিও হামলাকারী মুসলিম না হলেও প্রথমেই সন্দেহের তীর মুসলিমদের দিকে তাক করা হয়। এই ধারাবাহিক প্রচারণা মানুষের মনে ইসলামের প্রতি ভীতি এবং মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা জন্ম দেয়। পশ্চিমা পাঠ্যপুস্তক ও একাডেমিক চর্চাতেও ইসলামের বিকৃত উপস্থাপন করা হয়, যা নতুন প্রজন্মকে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয়। এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে দিতে এবং ইসলামের সুমহান ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত

করতে চায়। ফলে ইসলামফোবিয়া কেবল একধরনের ভয় বা বিভ্রান্তিই নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, যা মুসলমানদের মনোজগতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলছে।

**মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব: ঐক্য, শিক্ষায়ন ও দাওয়াহ:

পশ্চিমা বিশ্বের ষড়যন্ত্র ও ইসলামফোবিয়ার মোকাবিলায় মুসলিম উম্মাহর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজ মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো বিভক্তি—জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, মাজহাবভিত্তিক বিভাজন আমাদের শক্তিকে খণ্ডিত করে রেখেছে। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে, "*إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ*"—মুমিনরা পরস্পরের ভাই। এই ঐক্যের শিক্ষা বাস্তবে রূপ দিতে হবে। একইসাথে, মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। ইসলামিক শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও মিডিয়া জ্ঞানে দক্ষ হতে হবে, যাতে ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে যুক্তিনির্ভর ও তথ্যভিত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। দাওয়াহ কাজের ক্ষেত্রেও নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে—অনলাইন দাওয়াহ প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন, এবং ইসলামি সংস্কৃতি ও ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে, মানবতার ধর্ম হিসেবে এবং জ্ঞান ও সভ্যতার উৎস হিসেবে তুলে ধরা সময়ের দাবি।

**ভবিষ্যৎ করণীয়: ইসলামফোবিয়ার মোকাবেলায় শক্তিশালী পদক্ষেপ:

ইসলামফোবিয়া মোকাবিলায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে রাজনৈতিকভাবে একজোট হতে হবে। ওআইসি (OIC)-এর মতো সংগঠনগুলোকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামফোবিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলে কূটনৈতিক চাপ তৈরি করতে হবে। ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড যেমন কোরআন অবমাননা বা ইসলামবিদ্বেষী আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা, এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বয়কটের মতো পদক্ষেপ নিতে হবে। মুসলিম বুদ্ধিজীবী, আলেম ও স্কলারদেরও এগিয়ে আসতে হবে, যারা তথ্যনির্ভর, গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও ভিডিওর মাধ্যমে ইসলামফোবিয়ার ভুল ব্যাখ্যা ও ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে

পারবেন। মিডিয়া হাউস, প্রকাশনা সংস্থা, এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে মুসলমানদের ভাবমূর্তি পুনর্গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ইসলামফোবিয়ার বিরুদ্ধে এই লড়াই কেবল প্রতিরোধ নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

## ***অধ্যায় -২

***কুরআনের দলিল (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:৬):
***يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ***

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা যাচাই করে নাও; অন্যথায় তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেলবে, অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে।"

***হাদিস (সহিহ মুসলিম):

***كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ***

"মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য মানুষের এতটুকুই যথেষ্ট যে সে যা শোনে তা-ই বলে বেড়ায়।"

***আধুনিক বিশ্বে ইসলামভীতির বিস্তার ও মাধ্যম (The Mechanics of Propagation):

ইসলামোফোবিয়া (ইসলামভীতি ও বিদ্বেষ মূলত একটি সুগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক মানসিকতা, যা বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত। এর প্রধান উৎস ও কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:১. রাজনৈতিক এজেন্ডাবিশ্ব রাজনীতিতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখা এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বৈধ করার জন্য অনেক সময় পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামকে একটি আদর্শিক শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এটি সমাজে কৃত্রিম ভীতি তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের একটি সুপরিচিত হাতিয়ার।২. সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদপ্রাচ্যবাদ (Orientalism) এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মানসিকতা থেকে এই বিদ্বেষের জন্ম হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচ্যের (বিশেষত মুসলিম বিশ্বের) সংস্কৃতি ও ধর্মকে পশ্চাৎপদ বা 'অন্য' (Other) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ববোধকে উস্কে দেয়।৩. চরমপন্থা ও সাধারণীকরণখুবই নগণ্য সংখ্যক

উগ্রবাদী বা সন্ত্রাসীর কর্মকাণ্ডের দায়ভার সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর (১.৮ বিলিয়ন) ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ইসলামোফোবিয়ার অন্যতম বড় কারণ। ব্যক্তিগত অপরাধকে পুরো ধর্মের লেবাসে প্রচার করার মাধ্যমে এই অযৌক্তিক ভীতি ও ঘৃণা ছড়ানো হয়।৪. মনস্তাত্ত্বিক কারণঅচেনা বা ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি মানুষের সহজাত ভয় বা আতঙ্ক (Xenophobia) এখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় এই স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বকে বিভিন্ন নীতি, গণমাধ্যম ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারণার মাধ্যমে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়।বিশ্বজুড়ে এই বিদ্বেষ ও ভীতি মোকাবিলার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতি বছর ১৫ মার্চকে "ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আন্তর্জাতিক দিবস] হিসেবে পালন করে আসছে। ইসলামোফোবিয়ার গঠন ও ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে [রানিমেড ট্রাস্ট" (Runnymede Trust) -এর গবেষণা প্রতিবেদনগুলো পড়া যেতে পারে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের সাথে সাথে সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময় আর অবিশ্বাস্য এক ক্রোধ নিয়ে তাকিয়ে ছিল টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দৃশ্যের দিকে। সেই অবর্ণনীয় আর নির্দয় আক্রমণে নিহত হন ২৯৯৬ জন নিরীহ মানুষ। আহত হয় আরো প্রায় ৬ হাজার। ধ্বংস হয় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমানের সম্পদ। খবর উন্মোচিত হতে হতে সারা বিশ্ব ক্রমান্বয়ে জানতে পারলো এ ঘটনার সাথে জড়িত একটি ধর্মের নাম। বেশ ক'বছর ধরে চলতে থাকা একটি শব্দ 'ইসলামোফোবিয়া' আবার নতুন করে প্রাণ পেলো। আর সেই সাথে বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে, বসবাসরত মুসলিমরা উপহার পেতে শুরু করল একরাশ ঘৃণা, যে ঘৃণা পাবার মতো কোনো কাজই তারা করেনি।

একটি ধর্মকে ঢাল বানিয়ে আর অপব্যাখ্যা দিয়ে প্রাণের পর প্রাণ কেড়ে নিয়ে সন্ত্রাসীরা সাধারণ মুসলিমদের 'মুসলিম' পরিচয়কে অমুসলিমদের কাছে একটি ভয়ংকর ভয়ের বস্তু হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিল। ১৪০০ বছর আগে পরলোকগমন করা সেই ইসলাম ধর্মের মহান নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি এই 'মুসলিম' নামধারী ত্রাস সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে কী বলতেন? তাঁরই নাম ভাঙিয়ে তারা এ কাজগুলো করছে, কিন্তু আসলেই কি সে কাজগুলো এরকমভাবে অনুকরণীয় হবার

কথা? এই ইসলামভীতির কারণ, ফলাফল আর কিছু অপব্যাখ্যার প্রকৃত ব্যাখ্যা- এগুলোর আদ্যপান্ত নিয়েই কথা হবে আজকের লেখায়।

***২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার হামলা; সূত্রঃ বিজনেস ইনসাইডার-

যেদিন আমি টিভিতে খবরে দেখছিলাম টুইন টাওয়ার থেকে লকলকে আগুনের শিখা আর ধোঁয়া বের হচ্ছে, আর কিছুক্ষণ বাদে পুরো বিল্ডিংদুটো ভেঙে পড়ল, সেদিন আমি ছিলাম আমার খালার বাসায়। আমার ছোট এক কাজিনের সেদিন জন্মদিন ছিল। জন্মদিনের কেক কাটার জন্য ছুরি ওঠানো হয়েছে, তখনই পেছনে টিভিতে ব্রেকিং নিউজ দেখতে পেলাম। আমার বয়স তখন সবে মাত্র নয়, অবশ্যই এত কিছু বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না, বুঝিওনি। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে খুব খারাপ একটা কাজ হয়েছে; আর অনেকগুলো মানুষ মারা যাচ্ছে। কেন? কেন মারলো এভাবে? কার কী লাভ হলো?

বড় হতে হতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশোধের খেলা দেখলাম। দেখলাম কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের এক একটা দেশ আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইরাক, আফগানিস্তানে তাণ্ডবলীলা দেখলাম। আবার উল্টো রকমের কাহিনীও শুনলাম, এগুলো আসলে ইহুদি-নাসারাদের চক্রান্ত। একটা সময় 'আল-কায়েদা' নামের সংস্থাই ছিল সব, যে নাম শুনলে আমাদের মানসপটে ভেসে উঠত আক্রমণাত্মক এক ইসলাম ধর্মের কথা। এরপর এলো অন্যান্য সংগঠন- বোকো হারাম, আইসিস (ISIS) বা আইএসআইএল (ISIL), এখন সংক্ষেপে কেবল আইএস (IS) ইত্যাদি। "শান্তির ধর্ম ইসলাম"-এ বাণীটা ধীরে ধীরে সুদূর অতীত অনুভূত হতে লাগলো। কিন্তু এই ইসলামোফোবিয়া কি আগে ছিল না? নাকি ৯/১১ থেকেই এর শুরু?

Islamophobia শব্দটার সূত্রপাত '৭০ এর দশকেই হয়, কিন্তু জনপ্রিয় হতে থাকে '৯০ এর দিকে এসে। ১৯৮৯ সালে সালমান রুশদি'র 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' বইতে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে অপমান করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি রুশদির মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে ফতোয়া দেন। বিশ্ব তখন প্রথমবারের মতো দেখলো কীভাবে কোনো ফৌজদারি অপরাধ কিংবা খুনখারাবি না

করেও কেউ মৃত্যুহুমকি পেতে পারে এবং সে হুমকি আসে ধর্ম থেকেই। এর আগে এর সাথে পশ্চিমা বিশ্ব পরিচিত ছিল না। এর মাধ্যমে মূলত 'ব্লাসফেমি' আইন ব্যাপারটা দৃশ্যপটে আসে, যেটা ইসলামি দেশগুলোতে প্রচলিত আছে।

মধ্যযুগে ইউরোপের মানুষ ঠিকমতো জানত না যে ইসলাম কী। ইউরোপের খ্রিস্টানগণ যেহেতু খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারক যীশু খ্রিস্টকেই উপাসনা করত, তাই তারা ধরে নিয়েছিল মুসলিমরাও নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর উপাসনা করত। অনেকেই, বিশেষ করে ড্যান ব্রাউনের বই যারা পড়েছেন তারা 'ইনফার্নো'-র কথা শুনে থাকবেন, বা হয়ত মূল কবিতার বইটি পড়ে থাকবেন। সেখানে কবি দান্তে (Dante) এই চরম ইসলামবিদ্বেষ বা ভীতি থেকে তার 'ডিভাইন কমেডি' বইতে হযরত মুহাম্মাদ (স) আর হযরত আলী (রা)-কে ইনফার্নো বা দোযখের অষ্টম স্তরে দেখিয়েছিলেন! তাছাড়া তৎকালীন খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের কাছে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল 'Anti-Christ' নামে। অথচ তারা জানতো না, ইসলাম ধর্মেও হযরত ঈসা (আ) বা যীশুকে 'মাসীহ' বা খ্রিস্ট হিসেবে সম্মান করা হয়, যদিও ঈশ্বর হিসেবে না। তারা মুহাম্মাদ (সা) এর নামের কিছু বিকৃত রূপ ব্যবহার করত, যেমন Mahound; এ নামটিই ব্যবহার করে সালমান রুশদি তার স্যাটানিক ভার্সেস বইতে মুসলিমদের ক্রোধের কারণে পরিণত হন। মধ্যযুগীয় ইসলাম নিয়ে অজ্ঞতা থেকেই মূলত তখন ইসলামভীতি/ইসলামোফোবিয়া জন্মেছিল।

তবে ১৯৮৯ সালের ঘটনার পর থেকে মানুষ ইসলাম ধর্মকে ভয় পেতে থাকে। এ ধর্মকে বর্বর আর মৃত্যু-আনয়নকারী হিসেবে জানতে থাকে। 'ইসলামোফোবিয়া' শব্দের অর্থই তাই, ইসলামে প্রতি ভীতি, ইসলাম নামের আদর্শকে ভয় পাওয়া, ইসলাম ধর্ম পালনকারীদের কাছ থেকে ক্ষতির আশংকা করা।

কিন্তু কীভাবে এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডগুলো কুরআনের আয়াত দিয়ে বৈধতা দিয়ে দিচ্ছে এই ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো? কীভাবে মানবহত্যা বৈধতা পাচ্ছে ধর্মের নামে? চলুন দেখি, আসলেই ইসলামে কী বলা হয়েছে।

ইসলাম যে বর্বর ধর্ম সেটা প্রমাণ করার জন্য কুরআনের যে আয়াতটি সবচেয়ে বেশিবার ব্যবহার করে থাকে বিরোধীরা সেটা হলো সুরা তৌবার ৫ নং আয়াত। এটাকে 'সোর্ড ভার্স' (Sword Verse) বা 'তরবারির আয়াত' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ আয়াত ব্যবহার করেই আবার উল্লেখিত সংঘটনগুলো মানবহত্যা বৈধ করে থাকে। আয়াতে বলা হচ্ছে, "... পৌত্তলিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক..." [কুরআন ৯:৫]

কিন্তু তারা যে জিনিসটা উপেক্ষা করে যায় সেটি হলো এর আগের আর পরের কথাগুলো, এই আয়াতেই পুরো কথাটা হচ্ছে, "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে পৌত্তলিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [৯:৫]

এর প্রথম অংশ থেকে আমরা দেখতে পাই, 'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে'। অর্থাৎ এ আয়াতে বলা হচ্ছিল একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবার কথা। তার মানে এটা কেবল একটা নির্দিষ্ট ঘটনার কথা বলছে, যেকোনো জায়গায় ব্যবহারের জন্য নয়। কী সেই ঘটনা? আমরা ফিরে যাই একদম প্রথম আয়াতে- "সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সেই পৌত্তলিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।" [৯:১]
বোঝা গেলো যে, একটা চুক্তি হয়েছিল পৌত্তলিকদের সাথে মুসলিমদের। পৌত্তলিক বলতে মক্কার মূর্তিপূজকদের কথা বলা হচ্ছে, যাদের কারণে নবী (সা) জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৯:২ আয়াত যদি আমরা দেখি, সেখানে বলা হচ্ছে 'চার মাসের একটা সময়কালের' কথা। এটা নিষিদ্ধ সময়, এ সময়ে কোনো আক্রমণ করা যাবে না, যদিও পৌত্তলিকেরা চুক্তিভঙ্গ করেছে। চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, "তবে যে পৌত্তলিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, যারা তোমাদের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে

সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।" (৯:৪) অর্থাৎ যারা কথা রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার প্রশ্নই আসে না। তারা পৌত্তলিক বা অমুসলিম বলেই যে মেরে ফেলতে হবে তা নয়। এরপরেই আসে সেই বিখ্যাত ৯:৫ আয়াত, যেখানে হত্যার কথা বলা হয়েছে, তবে কেবল চুক্তি ভঙ্গকারী সেই পৌত্তলিকদের এবং অন্য কাউকে নয়। তবে তারা ক্ষমা চাইলে বা ইসলাম গ্রহণ করলে তারা মুক্ত।

তথাকথিত 'বর্বর' ধর্ম ইসলাম ৯:৬ আয়াতে বলছে, "পৌত্তলিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে।" কোথায় বলা হয়েছে মারার কথা?

এতটুকু থেকে কি বিষয়টা নিশ্চিত নয় যে এটা আসলেই কেবল একটা নির্দিষ্ট ঘটনার জন্য? কিন্তু কেউ যদি আগ-পিছ না বলেই মাঝখান থেকে এই আয়াত উদ্ধৃত করে বসে, তবে যে কারো কাছে ইসলামকে খুনী আর বর্বর ধর্ম শোনাবে। তাই নয় কি? পাঠকদের জানাবার জন্য বলি, তাফসির ইবনে কাসির ও অন্যান্য তাফসির থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই ঘটনাটা ঘটেছিল হিজরতের পর ষষ্ঠ বছরে (৬২৮ সাল) যখন মক্কার পৌত্তলিকেরা নিজেদের মিত্রদের নিয়ে মদিনাবাসী মুসলিমদের সাথে চুক্তি করে যে, কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। কিন্তু কুরাইশদের মিত্র বনু-বকর মুসলিমদের মিত্র গোত্র বনু-খুজা গোত্রের অনেককে হত্যা করে ফেলে। কুরাইশরা সেখানে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। ফলে চুক্তি ভেঙে যায় এবং ইসলাম কেবলমাত্র তখনই আক্রমণের আদেশ দিয়েছে যখন তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, এর আগে নয়।

যেই মক্কার পৌত্তলিকেরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে এত এত নিরীহ মুসলিমকে নির্যাতন করেছিল, যাদের কারণে মক্কা ত্যাগ করতে হয়েছিল মুসলিমদের, সেই মক্কা যখন নবী (সা) বিজয় করতে এলেন ১০ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে, তখন মক্কাবাসীরা নিশ্চিত ছিল আজ তাদের কপালে প্রতিশোধের মৃত্যু আছে। কিন্তু তাই কি হয়েছিল? প্রায় বিনা রক্তপাতে বিজিত মক্কা নগরীতে সেই নির্যাতন করা কুরাইশ পৌত্তলিকদেরকে হযরত

মুহাম্মাদ (সা) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন! এ আদর্শ কি মেনে চলে সেই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো? ৯/১১ এর তিন হাজার নিরীহ মানুষ বিনা কারণে হত্যার মাঝে কি কোনো নবীর আদর্শ কাজ করেছিল? কিংবা ব্রাসেলসে হত্যাকাণ্ড? ফ্রান্সের নিস শহরে মানবনিধন? লন্ডনে আক্রমণ? গুলশানের নারকীয় হত্যাকাণ্ড? কিংবা সিরিয়াতে এখন যা চলছে? কিংবা ম্যাঞ্চেস্টারের কিশোরদের কন্সার্টে এতগুলো মানুষ মারা? ফ্রান্সের নিসে, বারলিন বা মাদ্রিদে? এগুলোতে কোনো নবীর আদর্শ আছে, নাকি আছে কোনো আয়াতের আদেশ? নবী (সা) হলে এই নিরপরাধ হত্যার দায়ে কী বলতেন?

ইসলামোফোবিকরা বলে থাকেন, তরবারির জোরে আসলে ইসলাম প্রসার হয়েছিল। ঐতিহাসিক বিবেচনায় এটা অস্বীকার করার জো নেই যে ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রসারে যুদ্ধ আসলেই হয়েছিল, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে এর আগে বাইজান্টিন সাম্রাজ্যও যে একইভাবে প্রসার পেয়েছে। তাই বলে কি খ্রিস্টানধর্ম-ফোবিয়া জনপ্রিয়? না। আচ্ছা তার আগে বলা যায় খ্রিস্টান আর ইহুদীদের হেনস্তা করত রোমান সাম্রাজ্য। কিন্তু রোমান/গ্রিক ধর্ম এখন তেমন নেই বলে ফোবিয়াও বলে না। যখন 'ক্রুসেড' কথাটা মাথায় আসে তখন কাদের কথা মনে হয়? খ্রিস্টানদের কথা। তাদের ধর্ম রক্ষার্থে তারা 'সারাসিন'-দের (মুসলিম বাহিনী) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

উমার (রা) এর সময় মুসলিমদের অধিকারে আসে জেরুজালেম। জেরুজালেমের নগরকর্তা সোফ্রোনিয়াস অবাক বিস্ময়ে দেখলেন কোনো জাঁকজমক ছাড়াই হযরত উমার (রা) তাঁর দাস আর গাধা নিয়ে জেরুজালেম এসেছেন। নগরকর্তা তাঁকে ঘুরিয়ে দেখালেন পবিত্র শহরটি। নামাজের সময় হলে সোফ্রোনিয়াস তাঁকে চার্চে আহ্বান করলেন, কিন্তু উমার "না" বললেন। তিনি জানালেন, এখন যদি তিনি এই চার্চে নামাজ আদায় করেন, তাহলে পরে মুসলিমরা এই চার্চ ভেঙে মসজিদ বানিয়ে ফেলতে পারে। এতে খ্রিস্টানরা তাদের খুব পবিত্র একটি স্থান হারিয়ে ফেলবে। উমার (রা) এখানে কোনো জবরদস্তি করানো থেকে বিরত করলেন। এটাই সেই জায়গা যেখানে খ্রিস্টানরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে যীশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন আর এখানের গুহাতেই তাঁর দেহ রাখা হয়েছিল। উল্লেখ্য, সেই চার্চ বহু পরে (১০০৯ সাল) ফাতিমি খলিফা

আল-হাকিম উমার (রা) এর আদেশ অমান্য করে ভেঙে ফেলেন। অবশ্য পরে (১০৪৮ সালে) পুনর্নির্মিত হয়। এখনো আছে সেটি, নাম হলো Church of the Holy Sepulchre.

উমার (রা) তখন চার্চের বাইরে বেরিয়ে নামাজ পড়লেন। পরে সেখানে আরেকটি মসজিদ বানানো হয়, নাম দেয়া হয় 'মসজিদে উমার'।

ইহুদীদের জন্যও জেরুজালেম খুব পবিত্র জায়গা। খ্রিস্টান অধিকার থেকে মুক্ত করে উমার (রা) এ স্থানে ইহুদীদের পুনর্বাসনের জায়গা করে দেন। ৭০টি ইহুদী পরিবার এখানে চলে আসে। এই যে পরধর্মের ব্যাপারে যে অপূর্ব সহিষ্ণুতা তিনি দেখিয়েছিলেন, আজকের ইসলামোফোবিয়ার জন্য দায়ী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মাঝে কি তার রেশ মাত্র আছে? তাঁর এই কীর্তির মাঝে ধ্বনিত হয় সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিমের হাজারও কোটিবার আবৃত্তি করা, "লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়াদীন" [কুরআন, সুরা কাফিরুন, ১০৯ঃ৫] বা "তোমাদের ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার।"

তখন থেকে শান্তিময় সহাবস্থানে ছিল মুসলিম, খ্রিস্টান আর ইহুদীরা। কিন্তু খ্রিস্টানরা মেনে নিতে পারেনি এটা। ১১০০ সালের দিকে প্রথম ক্রুসেডের সময় গ্রন্থিত Gesta Francorum নামের লাতিন ইতিহাসবিবৃতি থেকে আমরা বিস্তারিত জানতে পারি তখন কী হয়েছিল। ১৫ জুলাই, ১০৯৯ সালের ঘটনা সেখানে লেখা আছে, "আমাদের লোকেরা (খ্রিস্টান ক্রুসেডার বাহিনী) সলোমনের মন্দিরেও (বাইতুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত খুন করছিল, এত বেশি মানুষ হত্যা করেছিল যে রাস্তায় রক্তের স্রোতের কারণে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল।" এবং এ রক্ত ছিল মুসলিমদের। আর মুসলিমদের সাথে সেখানের শান্তিপ্রিয় ইহুদিরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জেরুজালেম রক্ষা করতে যুদ্ধ করেছিল। ইবনে আল-ক্বালানিসির ইতিহাসগ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি ক্রুসেডারদের নির্মমতার কথা, "ইহুদীরা পরাজয়ের পর তাদের সিনাগগে (ইহুদী উপাসনালয়) জড়ো হয়, তাদের ভেতরে রেখেই পুড়িয়ে দেওয়া হয় সে সিনাগগ।" ইতিহাস কি এটা অস্বীকার করতে পারবে? শত বছর পর যখন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (যাকে পশ্চিমা বিশ্ব 'সালাদিন' নামে

চেনে) যখন জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন মুসলিমদের জন্য, তখন খ্রিস্টানরা ভয়ে ছিল তিনিও একই কাজ করবেন কিনা। কিন্তু এই 'বর্বর' ইসলাম ধর্মের অনুসারী সালাদিন কী করলেন? তিনি কোনো নিরীহ খ্রিস্টান জেরুজালেমবাসীকে ফুলের টোকাও দেননি, শত বছর আগের রক্তস্রোত তো দূরের কথা। এমনকি ক্রুসেডার ইতিহাসেও মহৎপ্রাণ হিসেবে দেখা হয় সালাহউদ্দিনকে।

জেরুজালেম নগরী। ঐ দূরে দেখা যায় ডোম অফ দ্য রকের সোনালি গম্বুজ। সূর্যের আলো পড়ে প্রায়ই মনোরম এক দৃশ্যের অবতারণ হয় সেখানে। ছবিসূত্রঃ Lonely Planet

আর রাজ্যপ্রসারের ব্যাপারটা খুবই আপেক্ষিক। তখন ছিল 'DO OR DIE' নীতির প্রচলন। ছোট মুসলিম জাতি যদি কিছু না করে বসে থাকতো, তবে খুব শীঘ্রই রোমান/বাইজান্টিন সাম্রাজ্য বা পারস্য সাম্রাজ্য শক্তিবলে মুসলিম রাষ্ট্র দখল করে নিতো, তাহলে ইসলাম টিকে থাকতে পারতো না। তাই নিজস্ব শক্তি বাড়াবার জন্যই দরকার ছিল রাজ্য বিস্তারের। যেন বাহিনীর আকারও বাড়ে, আবার প্রতিবেশী শত্রু রাজ্য বাইজান্টিন বা পারস্য রাজ্য তাদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের মুসলিম পরিচয় ধ্বংস করে দিতে না পারে। এটাকে 'Survival instinct'-ও বলা চলে। এটা কেবল ইসলামের জন্য নয়, অন্য সকল রাজ্যের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। আজকের দিনে এই ধারণাটা অদ্ভুত ঠেকে, কারণ এখন ছোট রাষ্ট্র হলেও কেউ তার সার্বভৌমত্ব নষ্ট করতে আসে না। তাই আজকের হিসাবে ১৪০০ বছর আগের কথা বিচার করা যায় না আসলে।

অনেকে বলেন, নবী (সা) তো বিনা বিচারে কুরাইজা বংশের অনেক ইহুদীকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন, এটাও তো নির্মমতা। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, বনু কুরাইজার ঘটনা ইসলামে নবী (সা) এর জীবনীর সবচেয়ে 'Debated' এবং সবচেয়ে সমালোচিত ঘটনা- কারণ, বর্তমান দুনিয়ার হিসেবে আমরা সেটা কল্পনাও করতে পারি না। এর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে আমরা তাফসির গ্রন্থে পাই ভিন্ন একটি কাহিনী, যার শিকড় অনেকদিন আগে প্রোথিত। ভুলে যাওয়া চলবে না যে, বনু কুরাইজার ঘটনার আগে দুবার পর পর দুটো ইহুদী গোত্র চুক্তি/সংবিধানের নিয়ম ভঙ্গ

বা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার পর তাদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয় খায়বার নামক জায়গায়। তৃতীয়বার আরো বড় মাপের এক বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে এই বিশ্বাসঘাতকদের জন্য কেবল বহিষ্কার শাস্তি প্রদান করাটা তখনের হিসেবে গুরু পাপে লঘু দণ্ড হয়ে যেত বলে সিরাতকারীরা উল্লেখ করেন। তখন সেই কুরাইজার ইহুদীদেরই বাছাই করতে দেওয়া হয় একজন ‘বিচারক’। সেই প্রাক্তন ইহুদী পণ্ডিতের ফয়সালা তারা মেনে নিতে রাজি হয়, যেমন শাস্তি ইহুদীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকতো আগে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে কোনো গোত্র বা জনপদ। নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ তৎকালীন তাওরাতের Deuteronomy 20:12-13 আয়াতের রেফারেন্স হতে তাদেরই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করা হয় যারা যোদ্ধা হবার যোগ্য ছিল; এ ঘটনা ইহুদী ইসরায়েলে আগেও প্রত্যাদেশিত হয়েছিল তাদের নিজস্ব গ্রন্থ অনুযায়ী। এক্ষেত্রে মুসলিম-চিন্তাটা এমন ছিলো যে, যদি বনু কুরাইজাকে হত্যা না করা হতো, তবে তারা আগের দুই নির্বাসিত ইহুদী গোত্রের সাথে গিয়ে সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করতো, তৃতীয়বার ক্ষমার পর চতুর্থবার একইভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চাল দেবে এটা সকলেই ধরতে পারছিল। এটা ঠেকানো দরকার ছিল তখন মুসলিমদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য। অপশন তখন নেমে এসেছিলো দুটোতে- ১) তাদের পুনরায় বহিষ্কার করে তিন ইহুদী গোত্রকে বড় জোট হয়ে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ দেওয়া অথবা ২) মুসলিম অস্তিত্ব রক্ষার্থে চরমতম শাস্তি দিয়ে বাকি গোত্রগুলোকে বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তিভঙ্গ করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা। ‘ইহুদী’ হওয়াটা এখানে মূল বিষয় ছিল না, অন্য কোনো বেদুইন গোত্র হলেও শাস্তি দেবার কথা ছিল। আগের দুবার লঘু শাস্তির পর তৃতীয়বার চরমতম দণ্ড। কিন্তু এই কাজ কেবল একবারই করা হয়েছিল। এ ব্যাখ্যাটা পাওয়া যায় সিরাত আর তাফসির থেকেই।

বর্তমানের চোখে নিষ্ঠুর এ শাস্তি এখনকার যুগে সমালোচিত, তবে তখনকার সময় অপরাধের শাস্তি হিসেবে অন্যান্য গোত্রও মেনে নিয়েছিল এটি। এটাকে এখনের চোখে ‘জাস্টিফাই’ কেউ করতে যাচ্ছে না। এবং এখানেই পার্থক্য টেররিস্ট অর্গানাইজেশনের সাথে সাধারণ মুসলিমদের। তারা ঠিকই পেছনের কাহিনীগুলো না জেনে কুরাইজা সাধন করে দিতে পারে।

এই একই নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) কিন্তু মক্কাবাসীদের ক্ষমা করেছিলেন, কারণ তারা বিশ্বাসঘাতক ছিল না। ইহুদীদের মধ্যে কেবল এই তিন গোত্রের সাথেই রাসুল (সা) এর শত্রুতা ছিল, আর কারো সাথে নয়। বাকি ইহুদীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কই ছিল মুসলিমদের। কেবল যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তারা ব্যতীত বাকি 'আহলে কিতাব'দের ব্যাপারে কুরআন খুবই উদার কথা বলেছিলঃ

"তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সেজদা করে। তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হলো সৎকর্মশীল।" [কুরআন ৩:১১৩-১১৫]

সত্যি বলতে ধার্মিকতার দিক থেকে মুসলিমদের পরই স্থান ইহুদীদের। ইসরায়েলের সাধারণ ইহুদীরা তাদের ধর্মের নিয়মকানুনের বিষয়ে ধার্মিক। অনেক মুসলিম আছেন যারা মুসলিম সমাজের নিজস্ব দোষ অনুসন্ধান না করে সকল কিছুকে 'ইহুদী-নাসারা' ষড়যন্ত্র আখ্যা দিতে পছন্দ করে। এটা সত্য যে, 'জায়োনিস্ট' বা ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাওয়া ইহুদীরা অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী ইহুদীরা ইসলাম ধর্মের ক্ষতি করেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সকল ইহুদী খারাপ বা তারা সকলেই মুসলিমদের ধ্বংস চায়। যেমন নিচের ছবিগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকজন ইহুদীকে যারা 'জায়োনিজম'-এর বিরোধী, এটা অনেকের কাছেই হয়ত বিস্ময়কর ঠেকবে!

ইহুদী জায়োনিস্ট সন্ত্রাসী সংগঠন ইরগুন জাই লিউমি যখন ১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেল উড়িয়ে দিয়েছিল, তখন থেকে কি ইহুদী ধর্মের উপর 'সন্ত্রাসী' তকমা লেগে গিয়েছিল? কিংবা জুডাইজমফোবিয়া (ইহুদিভীতি) শুরু হয়েছিল? হয়নি। অবশ্য মুসলিম সমাজে ইহুদীভীতি রয়েছে এবং ঘৃণাও রয়েছে যৌক্তিক কারণে- নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর সন্ত্রাসী হামলাগুলোর কারণে। কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, ইসরায়েলের সাধারণ ইহুদীরা চায় না এই হামলা হোক। তারাও

শান্তিই চায়, যেমন মুসলিমরা চায়। (ইহুদী ধর্মের ইতিহাস জানতে চাইলে রোরের এ সিরিজটি পড়া শুরু করতে পারেন: ইহুদী জাতির ইতিহাস)

কুরআনে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কেও প্রশংসা করা হয়েছে। তাছাড়া আবিসিনিয়ার নাজ্জাশির মহানুভবতার কথা ইসলামি ইতিহাস জানা যে কেউ জানেন। খ্রিস্টানদের থেকে ইহুদী নেতারা মুসলিমদের প্রতি বেশি শত্রুতা দেখিয়েছিল। এবং এখনো আমরা সেটা দেখতে পাই, ইসরায়েল ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে। কিন্তু সেই তুলনায় প্রাথমিক যুগে খ্রিস্টানরা অনেক নমনীয় ছিল মুসলিমদের প্রতি। এজন্য কুরআন বলছেঃ

“আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী (তারা জোট হয়েছিল তিন গোত্র) ও পৌত্তলিকদেরকে (তখন মক্কার কুরাইশ) পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রিস্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না।” [কুরআন ৫:৮২]

বর্তমান বিশ্বে সাধারণ মুসলিমদের বেশিরভাগ অভিযোগ যাদের নিয়ে সেই ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের মিত্রতা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে। রাজনৈতিক স্বার্থে এরকম হতেই পারে বর্তমানে। কিন্তু পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার জের ধরে এই রাষ্ট্রীয় মিত্রতার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মানা করা হয়েছে কুরআনে ইহুদী বা খ্রিস্টানদের সাথে মিত্রতা করতে- “তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের মিত্র।” [কুরআন 5:51]
মূলত বিশ্ব রাজনীতি আর ‘World Domination’ নামের ধারণাগুলোর কারণে সাধারণ মানুষ পড়ে যায় যাঁতাকলে। আর সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর কারণে সাধারণ ধার্মিকরা উভয় সংকটে পড়ে। এর থেকে মুক্তির উপায় কী?

‘Scripture’ বা ধর্মগ্রন্থ বলতে যা বোঝায় তা বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য থাকে তাফসির। সব ধর্মের ক্ষেত্রেই। যেমন ইহুদীদের রয়েছে তাওরাতের সাথে তানাখ বা তালমুদ। ফতোয়াও দেখা যায় স্থান আর সময়ভেদে মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কিছু

জিনিস স্থির থেকে যায়, যেমন ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্ব- এগুলো আজীবনের জন্য ধ্রুব। কিন্তু প্রসঙ্গ না জেনেই যদি কেউ উল্টা পাল্টা আয়াত প্রয়োগ করতে থাকে তখনই হয় সমস্যা। যেমন কুরআনে আয়াত আছে মাতাল অবস্থায় যেন কেউ নামাজ আদায় না করে (৪:৪৩), অর্থাৎ মাতলামি কাটলে পড়তে হবে। এখন কেউ মদ খেয়ে যদি বলে কুরআনের নিয়ম ভাংলাম না, নামাজের সময় মাতাল থাকব না, তাহলে? কারণ ঐ আয়াত নাজিলের সময় তখনো মদ হারাম হয়নি ইসলামে। মোট চার ধাপে হারাম হয়। চূড়ান্ত নিষিদ্ধকরণ আয়াত আরও পরে আসে। এভাবে আসলে মাঝখান থেকে আয়াত শানে নুজুল ছাড়া নেওয়া যায় না। এর জন্য লাগে বিস্তারিত পড়াশোনা। এ জিনিসটা না করবার কারণেই আসলে 'ব্রেইনওয়াশ' ব্যাপারটা সহজে হচ্ছে। পড়াশুনা না থাকায় ধর্মকে ব্যবহার করা সন্ত্রাসীরা সহজে এমন মানুষকে হাত করতে পারে।

পেছনের কাহিনী না জেনে গুগল সার্চ থেকে শখানেক লাইন কপি-পেস্ট করে তর্ক করতে আসে অনেক ইসলামভীতি ছড়ানো মানুষ। তবে মেঘে আর বেগুনে আল্লাহর নাম আঁকা ফটোশপ করা ইমেজ দেখেই লাখখানেক সুবহানাল্লাহ কমেন্ট করা সেই পড়াশুনা না করা মুসলিমরাও হতাশার উদ্রেক করে! ধর্ম তো মানুষের কল্যাণের জন্যই সূচিত। অথচ কোনো এক কারণে ধর্মকে খোঁচা দিয়ে লিখে অনেকে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেন, বিজ্ঞানের যুগে ধর্মের অসারতা প্রমাণ করে উল্লাস অনুভব করে থাকেন বা চর্বিত চর্বণের মতো ঘুরে ফিরে এক জাতীয় টপিক নিয়ে পড়ে থাকেন। যেমন- জনপ্রিয় একটি টপিক তাদের জন্য 'নবীজীর বিবাহ'। তৎকালীন আরবে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ অনেক কিছুই ছিল গ্রহণযোগ্য। এটার জন্য তাঁকে এমনকি তাঁর চরম শত্রুরাও অভিযুক্ত করে নি। কিন্তু ১৪০০ বছর বাদে আজ অনেক অভিযোগকারীর শেষ নেই। এখানে 'Polygyny' (বহুপত্নী) নিয়ে অনেকে অভিযোগ করেন। কিন্তু আমাদের কি এই অধিকার আছে হিমালয়ের কোলে যেসব গোত্র 'Polyandry' (বহুপতি) পালন করে, তাদের বিষয়ে বিচার করবার কিংবা নাক সিটকানোর? তাহলে ১৪০০ বছর আগের হিসেবে না করে কেন তারা এখনের হিসেবে ঐ বিষয়গুলো বিচার করে থাকেন? এমন তো নয় যে, সকলকে বহু বিবাহ করতে বাধ্য করেছে ইসলাম, বরং এক বিবাহই করতে বলেছে! মূলত ইসলামোফোবিয়া সৃষ্টির জন্য সন্ত্রাসীদের পর

এই বিতর্কিত প্রশ্নগুলো উত্থাপনকারীরাই দ্বিতীয় স্থানে আছেন বোধ করি। অথচ ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা গভীরভাবে করলে সৌন্দর্যটুকু চোখে পড়ত। ইসলামোফোবিয়ার কথা আসতো না।

এটা সত্য যে যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামোফোবিয়া বাড়ছে। কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্য একই সাথে মুসলিমের সংখ্যাও বাড়ছে এবং কেবল ইমিগ্রেশনই এটার একমাত্র কারণ নয়। ২০১০ সালের Association of Religion Data Archives এর সমীক্ষা অনুযায়ী, ৯/১১ এর পর আমেরিকাতে মুসলিম জনসংখ্যা ৬৭% বেড়েছে, যার মধ্যে ধর্মান্তরিতরাও রয়েছে। ২০০০ সালে ১ মিলিয়ন মুসলিম ছিল আমেরিকাতে, ২০১০ সালে সেটা ২.৬ মিলিয়নে দাঁড়ায়। আর ২০১৫ সালে সেটা ৩.৩ মিলিয়ন হয়েছে। ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছেন এমন আমেরিকানদের বেশ কিছু সাক্ষাৎকার আমি আগ্রহ নিয়ে পড়েছিলাম, সেখানে তারা বলেছেন হয় তারা আগে ইসলাম নিয়ে জানতেনই না অথবা ইসলামোফোবিক ছিলেন একদম। এরপর যখন নিজে থেকে ইসলাম নিয়ে পড়া শুরু করেছেন, তখন ধর্মান্তরিত হয়েছেন।

২০১৭ সালের ১ মার্চ টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ মুহূর্তে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তার চেয়েও বেশি হারে বাড়ছে মুসলিমদের সংখ্যা। ২০৫০ সালের মাঝে বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়বে ৩৭%, কিন্তু মুসলিম জনসংখ্যা বাড়বে ৭৩%! এবং এই ধারায় চললে ২০৭০ সালে খ্রিস্টধর্মকে পিছনে ফেলে ইসলাম হবে সবচেয়ে বেশি মানুষের পালিত ধর্ম। এ ব্যাপারটা যথেষ্ট অবাক করার মতোই বটে। কারণ এত সন্ত্রাসী হামলার পরেও, এত ইসলামোফোবিয়া বাড়বার পরেও কেবল নিজস্ব পড়ালেখার কারণে ইসলামে ধর্মান্তর হবার হার এত বেশি কেন? তার মানে কি এই নয় যে আসলেই ইসলাম এই বর্বরতাগুলো সমর্থন করে না? এবং এগুলো ধর্মের নাম ব্যবহার করা সন্ত্রাসীদের কর্মই কেবল?

আপনি কীভাবে ধর্মকে নেবেন সেটা আপনার নৈতিকতার উপর নির্ভর করে। একই ফুল থেকে মৌমাছি নেয় মধু, আর মাকড়শা নেয় বিষ; একই চাকুতে কেউ আপেল কাটে, কেউ কাটে গলা! এটাই যদি না হয়, তাহলে কীভাবে একই কুরআন থেকে বিপরীত মেরুর ব্যাখ্যা দেয় সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো, আবার দেন একজন শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রচারক? একই 'Scripture' থেকে কেউ পায় শান্তির ধর্ম আর কেউ পায় মানুষ হত্যার বৈধতা! কুরআন বলছেঃ "যে ব্যক্তি নির্দোষ কাউকে হত্যা করল (হোক মুসলিম কি অমুসলিম) সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করল, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করল।" [কুরআন, ৫:৩২] বাগদাদের বাজারে ঈদের কেনাকাটা করতে আসা হাসিখুশি মানুষগুলোর কী দোষ ছিল? গুলশানের দোকানে খেতে যাওয়া ফারাজদের দোষ কী কেউ বলতে পারবেন?

ইসলামের নাম ভাঙিয়ে কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করলে তাকে সন্ত্রাসী বলতে আর ইসলাম কে বর্বর বলতে আপত্তি করা হয় না মিডিয়াতে। কিন্তু সেই একই কাজ যদি অমুসলিম বা শ্বেতাঙ্গ কেউ করে থাকে, তবে গোড়াতেই তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, নিদেনপক্ষে 'মাস শুটার'। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখের নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের দুটো মসজিদের ঘটনা দেখা যাক। সেখানে আল-নূর মসজিদে মারা যান ৪১ জন আর লিনউড মসজিদে ৮ জন। হত্যাকারী একজন White Supremist অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গরাই সর্বসেরা এই নীতির প্রচারক, নাম ব্রেন্টন ট্যারান্ট। তার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, তার বন্দুকের গায়ে লেখা হরেক রকমের লেখনি (যেমন MALTA 1565, VIENNA 1683, CHARLES MARTEL, TOURS 732 ইত্যাদি) সব নির্দেশ করে মুসলিমদের উপর খ্রিস্টানদের ঐতিহাসিক বিজয়গুলোর। অথচ তার পরিচয় হিসেবে দায়ী করা হয়নি খ্রিস্টধর্মকে। গোড়াতে তাকেও চেষ্টা করা হয় মানসিক ভারসাম্যহীন প্রতিপন্ন করতে, কিন্তু তার নিজের লাইভ ভিডিওতে গণহত্যা আর প্রকাশিত ম্যানিফেস্টো সেই উপায় আর রাখেনি, তাকে জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে ধর্মকে জড়ানো হয়নি। এমনটা কিন্তু ইসলামের নাম নিয়ে করা সন্ত্রাসেও হওয়ার কথা ছিল! সন্ত্রাসীর যে আসলে ধর্ম নেই!

ধর্ম নিয়ে অনেক অভিযোগেরই অনেকে উত্তর দিতে চায়, কিন্তু হয়ত দেয় না, কারণ সেক্ষেত্রে ইসলামবিরোধীদের কাছে গালি খেয়ে বসতে পারে, বা 'Trolled' হতে পারে।

আবার ধর্মের সমালোচনা করতে গেলেও সংবেদনশীলদের কাছে গালি খেয়ে বসে না তা নয়। অথচ এমনটা না হয়ে যদি একটি সুস্থ, সুন্দর আলোচনা হতো, তবে বুঝিয়ে সুজিয়ে ইসলামভীতি দূর করা কোনো ব্যাপার নয়! দরকার শুধু একটু চেষ্টা, একটু পড়াশোনা। যদি আপনার পড়াশোনা করবার সুযোগ থাকে, আপনি কেন বসে রইবেন? আপনি পড়ুন আর অন্যকে জানান। হয়ত আপনার একটি কাজের জন্য একজন মানুষের ঘৃণা লোপ পাবে।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং আমার প্রিয় একজন ধর্মতত্ত্ববিদ। তাঁর বলা একটা গল্প আমার খুব প্রিয়, দুই সহস্র বছরেরও আগে যখন খ্রিস্টধর্ম বা ইসলাম ধর্ম আসেনি, ইহুদি পণ্ডিত হিল্লেল-এর কাছে এক পৌত্তলিক এলেন, বললেন, “আপনি যদি এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পা ফেলার আগেই ইহুদি ধর্মের মূলকথা বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমি এখনই বিশ্বাস আনব ইহুদিদের ঈশ্বরের উপর।”

হিল্লেল বললেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে, “যা তোমার নিজের কাছে কষ্টদায়ক আর ঘৃণ্য, সেটা তোমার প্রতিবেশীর প্রতি করবে না কোনোদিন। এটাই হলো ধর্মগ্রন্থের মূল কথা। আর বাদ বাকি যা আছে পুরোটা তার ব্যাখ্যা। এখন যাও, পড়ো সেটা। বোঝো।”

আর্মস্ট্রঙের মতে, এটা হলো সকল ধর্মের সোনালি নীতি (‘Golden Rule’)। ঠিক এ নিয়মটা যদি সকল ধর্মাবলম্বী মেনে চলে তবে ধর্মীয় রেশারেশি কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহ উঠে যেত।

আপাতত দুর্ভাগ্যজনকভাবে নাইন ইলেভেন-পরবর্তী জঙ্গি ধর্ম হিসেবে বেস্টসেলারে পৌঁছে যাওয়া ইসলাম ধর্মের প্রসঙ্গেই আসা যাক। একটু আগে বলা সোর্ড ভার্স হিসেবে পরিচিত “যেখানেই অমুসলিম দেখবে, হত্যা করো”- এটা ইসলামোফোবিক এবং ধর্মবিদ্বেষীদের খুবই প্রিয় একটি রেফারেন্স। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, তারা জানে এর আগে পিছে অনেক কিছুই আছে যেটা পড়লে ‘শুধু’ এই চরণটা অসার হয়ে যায় অনেকটাই। কিন্তু কোনো মুসলিম যদি সত্যি সত্যি ‘কনটেক্সট’ বা ‘প্রসঙ্গ’ কথাটা বলতে আসে, তবে একটা খোঁচা বা বিদ্রূপ তাকে শুনতে হবে। যেন পেছনের কথা জানাটা একটা পাপ, আর প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেওয়া একটা অধিকার, আর “দেখেছেন,

আমিও জানি”- এই ভাব নেওয়ার একটা অজুহাত। হলফ করে বলা যায়, বেশিরভাগ ধর্মবিরোধী কেবল গোটা শয়েক পরস্পর বিরোধিতার লিস্ট থেকে কপি পেস্ট করতে ওস্তাদ। এর বাহিরে প্রশ্ন করলে, ওখানেই দৌড় শেষ। ব্যাপারটা কেবল ইসলামোফোবিকদের ব্যাপারে না, ধর্মপালনকারীদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। অনেকেই এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হলে প্রথমে ‘নাস্তিক’ গালি দিতেই পছন্দ করেন ব্যাখ্যা সহকারে উত্তর দেবার বদলে। অথবা কেউ হয়ত সেদিকে যানই না খোঁটা শুনবার আশংকায়।

ধর্মের উপযোগিতা প্রসঙ্গে আসি। ধর্মকে যদি কেবল একটা System হিসেবে দেখি অর্থাৎ বিশ্বাস অংশটুকু বাদ দিয়ে, তাহলে তার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে অনেকের কাছে। কিন্তু এটা কি সবসময় এমনটাই ছিল? অনেকে বলে, ধর্ম না থাকলে সমাজটা কেমন ভিন্ন হত? একটা উদাহরণ শুরুতেই মাথায় আসে। শিশুহত্যা বা Child infanticide। বিশেষত সদ্যজাত মেয়ে শিশু যে মেরে ফেলা হতো।

ইসলামপূর্ব যুগে দারিদ্র্যের অজুহাতে এভাবে মেয়ে শিশু মেরে ফেলা হতোঃ
১) সরাসরি গর্তে পুঁতে ফেলা।
২) পাহাড় থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়া
৩) পানি বা মদের ড্রামে ডুবিয়ে মেরে ফেলা
৪) জঙ্গলে ফেলে আসা, যেন হিংস্র জন্তু খেয়ে নেয়

একবার একজন এভাবে তার একটু বড় হওয়া মেয়েকে যখন মাটিতে পুঁতে ফেলছিল দাঁড়া করিয়ে, তখন লোকটার দাঁড়িতে ধুলো লাগে, মাটি লাগে। যে মাটি দিয়েই সে মেয়েটিকে কোমর পর্যন্ত পুঁতে ফেলেছে। মেয়েটি ভেবেছে এটা বুঝি একটা খেলা, কিন্তু বাবার দাঁড়িতে ধুলো দেখে সে সেটা ঝেড়ে দিল। প্রচণ্ড কষ্টের মাঝেও অনেকটা সামাজিক দায়বদ্ধতা (‘Norm’) থেকে সে মেয়েটিকে পুঁতে ফেলা থামালোই না।

বহু বছর পরে তার এই অতীত পাপ সে নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর কাছে বর্ণনা করছিল, আর দু’চোখ দিয়ে পানি বইছিল। নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাকে থামিয়ে দিয়ে সরে যেতে বললেন এই ভয়ংকর কাহিনী শুনে।

ইসলামে নিষেধের পর আর একটি শিশুও আরবে মুসলিম পরিবারে মারা হয়নি। ইসলামের আগে মক্কাবাসীরা বিশ্বাস করত না পরকালে শাস্তি দিতে আবার ওঠানো হবে, তাই এই খুনের বদলাও আর কোনদিন হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে এক্ষেত্রে কি ইসলামের উপযোগিতা ছিল না? এই শিশুহত্যা কিন্তু ১৫০০ বছর আগে থেমে যায়নি, যুগে যুগে নানা সমাজে প্রচলিত রয়ে গেছে! তবে এ আয়াত আর পরকালের ভয়ের পর কি নৈতিকতা বদলে গেল মানুষের?

"(শেষ বিচারের দিন) যেদিন পুঁতে ফেলা জীবিত সেই মেয়ে শিশুটি জিজ্ঞেস করবে, কোন অপরাধে তাকে মেরে ফেলেছিল?" [৮১:৮-৯]

"দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।" [17:31]

এক লোক নবীর (সা) সামনে নিজের ছেলেকে চুমু খেয়ে এক পায়ের উপর আদর করে বসালো, কিন্ত সাথে থাকা মেয়েটিকে কিছুই করল না। এটা দেখে নবী সাথে সাথে বললেন আর কোনোদিন যেন এমনটা না করে। এরপর নবীজীর কথাতে লোকটি তার মেয়েকে চুমু খেয়ে অন্য কোলে বসালো।

Compassion বা 'মমতা' বস্তুটা ইসলাম ধর্মে উপস্থিত কিনা সেটা অনেকের প্রশ্ন। 'কম্প্যাশন' এর সঠিক বাংলা কী হতে পারে? দয়া? অনুকম্পা? ক্ষমাশীলতা? নাকি শুধুই মমতা? আজকাল 'গেম অফ থ্রোন্স'-এর যুগে রাজ্য দখলের ব্যাপারে খুবই উৎসুকভাবে ভক্তরা বসে থাকে, এরপর কী হতে চলেছে? কিন্তু এটা যে হাজার হাজার বছর আগে একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল সেটা মেনে নিতে বুঝি কষ্ট হয়। বাইজান্টিন আর্মি যেমন ছিল, পার্সিয়ান আর্মি যেমন ছিল, তেমনই মুসলিম আর্মিও ছিল। এবং অবধারিতভাবেই যুদ্ধ হয়েছিল। সাম্রাজ্য তো কোনোদিন বিনা যুদ্ধে বাড়েনি। একটু আগে সেটা ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

একটা জিনিস জানা জরুরি, নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর মক্কা জীবন আর মদিনা জীবন আলাদা। তায়েফে যখন গিয়েছিলেন, তখন পাথরের আঘাতে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে পায়ের জুতোয় জমাট বেঁধেছিল। মক্কার জীবনটা ছিল অত্যাচারময়, জীবন বাঁচাতে চলে যান মদিনায় এবং ঘুরে যায় মোড়। এবার তিনি শাসক। এক্ষেত্রে সব জায়গায় compassion বা মমতা দেখালে বা মাফ করে দিলে রাষ্ট্র চলবার কথা না। তাই নিয়মানুযায়ী সাজা তিনি দিয়েছেন বটে। এটাই কি অবাক করা না যে, একই মানুষের কীর্তিকলাপে আছে ইহুদী গোত্রের ইহুদী নীতি মাফিক কতল, আবার ১০ হাজার অস্ত্রধারী নিয়ে সেই অত্যাচারী মক্কা শহরে প্রায় বিনা রক্তপাতে প্রবেশ?

আসলে অবাক হবার নয়। একই যীশু বলেছেন, তোমাকে এক গালে কেউ চড় দিলে তোমার অন্য গাল পেতে দাও। আবার শেষে এসে অত্যাচারিত হয়ে তিনিই খ্রিস্টধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে বলছেন,
“Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword.” [Matthew 10:34]

এটা কি বাইবেলের প্রেমময় যীশুর পরস্পরবিরোধী কথা? নাকি নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর মতোই কখনো নিষ্ঠুর আবার কখনো বা দয়ার অবতার হওয়া? এটা আসলে ইসলামের অপ্রাসঙ্গিক আয়াত উদ্ধৃত করে বর্বরতা প্রমাণের চেষ্টার মতোই ব্যাপার, কেবল খ্রিস্টান সংস্করণ।

এগুলোর পেছনের প্রত্যেক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গেলেই বই এর মতো হয়ে যেত। কিন্তু অনেকটা এক কথাতে বলতে গেলে, যস্মিন দেশে যদাচার। ইহুদীদের থেকে ব্যক্তিগতভাবে দূরে থাকতে বলা হলে, কোনোদিনই হযরত মুহাম্মাদ (স) ইহুদিনীর বাড়িতে দাওয়াত খেতে যেতেন না, যেতেন? বিশ্বাস করেই গিয়েছিলেন এবং গিয়ে জানলেন খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন সেই ইহুদিনী। হযরত মুহাম্মাদ (স) তখন মারা যাননি। তাঁকে হত্যার চেষ্টাকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কারণ মহিলাটির হাতে নবীর প্রাণ তো যায় নি; মহিলাটিকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সত্যি

সত্যি যখন এক সাহাবী তার বিষ মেশানো গোশত খেয়ে মারা যায়, তখনই কেবল চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া হয় ইহুদী মহিলাটিকে।
মনে পড়া একটা ঘটনা দিয়ে এই বিশাল পোস্ট শেষ করি।

মক্কায় অতিষ্ঠ এক বুড়ি মক্কা ছেড়ে চলে যাবে। এই শহর নাকি তার থাকার অযোগ্য হয়ে পড়ছে। তাই বাক্স পেটরা নিয়ে তিনি মক্কা ত্যাগের জন্য রওনা দিলেন। কিন্তু বুড়ি মানুষ, এত কিছু নিতে পারছেন না, তাকে সাহায্য করতে এক লোক এলেন। নিজের কাঁধে মালামাল নিয়ে বুড়িকে এগিয়ে দিতে লাগলেন। বুড়ি তার সাথে গল্প জুড়ে দিল, তার প্রধান সমস্যা হলো 'মুহাম্মাদ' নামের এক নব্য উন্মাদ নাকি সবাইকে বিপথে নিয়ে চলেছে, দেবদেবীদের ছায়াও নাকি মাড়ায় না। যে শহরে এই বাপ-দাদার বিশ্বাস ধ্বংসকারী উন্মাদ থাকতে পারে, সেই শহরের খতম আসন্ন। এ জন্যই বুড়ি চলে যাচ্ছেন। এই মুহাম্মাদ নামের লোকটার চেহারাও তিনি দেখতে চান না জীবনে।

মাথা নেড়ে নেড়ে পুরোটা শোনার পর যখন পথ শেষ হয়ে এলো, তখন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন বুড়ি, "এই শহরে তেমন বের হতাম না, অনেকদিন পর এরকম দয়ালু মহানুভবতা দেখলাম। তোমাকে খুবই ধন্যবাদ। তোমার নামটা তো জানা হলো না?"
"এতক্ষণ যার কথা বলছিলেন, আমিই সেই মুহাম্মাদ।" মুচকি না হেসে তিনি এরকম কথা কখনো বলতেন না।
বুড়ির মক্কা প্রস্থান পরিকল্পনা ওখানেই শেষ।
এটাকে বলা হয় compassion বা মমতা।
মিল পাচ্ছেন আদৌ এই দয়ার নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে আজকের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কল্পিত মুহাম্মাদ (সা) এর?

ফিরে আসি সেই সোনালি নীতিতে, যদি সব ধর্মই এমনটা মেনে চলতো, তাহলে কোনোদিন ইহুদী মুসলিম দাঙ্গাও বাঁধত না, খ্রিস্টান-মুসলিম ক্রুসেড যুদ্ধও হতো না। হতো না Spanish Inquisition-এর যুগে খ্রিস্টানদের হাতে লাখো ইহুদী আর

মুসলিমের প্রাণ হরণ, কিংবা হতো না গত শতাব্দীতে এসে ইহুদী গণহত্যা। আর সব শেষে, এই ইসলামি জঙ্গিবাদ কিছুই আসতো না।

তুমি নিজের জন্য যেটা কষ্টদায়ক মনে করো, সেটা অন্যের জন্য করো না। প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি আপনার অনুসিদ্ধান্ত এখান থেকে সরে গিয়ে আক্রমণাত্মকতার দিকে ভীড়ে যায়, তবে বুঝতে হবে আপনার বোঝাতে ভুল আছে।

যার সাথে আপনার মতের মিল পড়ছে না তাকেই 'কাফির' উপাধিতে ভূষিত করা থামান, যাকে তাকে ইহুদী-নাসারার এজেন্ট বলে গালি দেওয়া বন্ধ করে দিন, যদি মনে হয় সে ভুল করছে, তবে ভদ্রভাবে বোঝান। "যে ব্যক্তি আরেকজনকে 'কাফির' বলে ডাকলো অথচ সে আসলে তা নয়, তবে যে ব্যক্তি এই কাজ করলো সে নিজেই কাফির।" [সহিহ বুখারি ৮0:৭৩0:১২৫ এবং সহিহ মুসলিম ১0:১১৭]

তর্ক করতে গিয়ে গালি দিয়ে বসবেন না। "তোমরা তাদেরকে গালি দিও না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে।" [সুরা আনআম 6:108]

সেই নাইন ইলেভেনের সময়ের নয় বছরের ছোট আমি আজ ব্যাচেলর পাশ করে ফেলেছি, মাস্টার্সও শেষ প্রায়। যার জন্মদিনের কেক খাচ্ছিলাম সেদিন সেই খালাতো বোনটিও আজ বড় হয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। এই ছোট থেকে বড় হওয়া আমাদের প্রজন্মটা অনেক বিশাল কিছু পরিবর্তন দেখে বড় হয়েছে। দেখেছে যুদ্ধ আর হানাহানিতে ছেয়ে যাওয়া এক পৃথিবী, আর দেখেছে ধর্মকে সে যুদ্ধগুলোর বাহানা হিসেবে ব্যবহার করতে; দেখেছে ধর্মকে বর্ম করে সন্ত্রাসের চারণা। দেখেছে ইসলামফোবিয়ার পূর্ণরূপ।

পৃথিবীটা খুব খারাপ হয়ে পড়ছে। তবে মানুষ স্বপ্ন দেখে এখনও। একটি ইসলামোফোবিয়ামুক্ত সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন; ধর্মবিদ্বেষ আর হানাহানি অরাজকতামুক্ত এক পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা।

## ***অধ্যায় ৩:

কুরআনের দলিল (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩):
***يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ***

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে-ই, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।"

***হাদিস (মুসনাদ আহমদ):
***لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى***

"কোনো আরবের ওপর অনারবের, অনারবের ওপর আরবের, কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের, কিংবা কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; একমাত্র তাকওয়া ছাড়া"।

***ব্যক্তি ও সমাজে ইসলামোফোবিয়ার প্রভাব (The Impact on Individuals and Society):

ব্যক্তি ও সমাজে ইসলামোফোবিয়া বা মুসলিমবিদ্বেষ গভীর এবং সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। ইসলামোফোবিয়ার কারণে মুসলিমরা প্রতিনিয়ত যেসকল প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, তা নিচে তুলে ধরা হলো:

*১. মানসিক ও শারীরিক নিরাপত্তাবর্ণবাদী হামলা ও হেনস্থা:

প্রকাশ্য স্থানে, বিশেষ করে দৃশ্যমান মুসলিম নারীরা (হিজাবি) প্রায়শই মৌখিক ও শারীরিক হেনস্থার শিকার হন।হতাশাজনক পরিসংখ্যান: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাজ্যে রেকর্ড সংখ্যক ইসলামোফোবিক হেট ক্রাইম বা ধর্মভিত্তিক বিদ্বেষমূলক অপরাধের ঘটনা ঘটেছে।

*২.মনস্তাত্ত্বিক ট্রমা (Psychological Trauma)পরিচয় সংকট (Identity Crisis):

বৈষম্য ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তরুণ মুসলিমদের মধ্যে নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে হীনম্মন্যতা ও দ্বিধা তৈরি হয়।মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা: সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, ভয় এবং ক্রমাগত সন্দেহের চোখে দেখার কারণে মুসলিম যুবসমাজ উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং ট্রমা-পরবর্তী মানসিক সমস্যায় (PTSD) ভুগতে পারে।

*৩.অর্থনৈতিক বৈষম্যচাকরি ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য: চাকরিক্ষেত্রে মুসলিম নাম বা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে অনেকেই বৈষম্যের শিকার হন। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও অনেক সময় অন্যায্য আচরণের সম্মুখীন হতে হয়।আবাসন ও উচ্চশিক্ষা পক্ষপাতিত্বের ফলে মুসলিমরা মানসম্মত আবাসন এবং উচ্চশিক্ষায় সমসুযোগ লাভের ক্ষেত্রেও বাধার সম্মুখীন হয়।

*৪.সামাজিক মেরুকরণ (Social Polarization)বিশ্বাসের ঘাটতি:

ইসলামোফোবিয়ার বিস্তারে মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিবেশীদের মধ্যে আস্থার সংকট ও ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়।ঘোটাবদ্ধ সমাজ (Ghettoization): ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে মুসলিমরা সমাজের মূল স্রোত থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়, যার ফলে নির্দিষ্ট এলাকায় ঘোটাবদ্ধ বা বিচ্ছিন্ন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

*ইসলামোফোবিয়া সচেতনতা মাস কি?

নভেম্বর হল ইসলামোফোবিয়া সচেতনতা মাস এবং এর ইতিবাচক অবদান প্রদর্শনের লক্ষ্য যুক্তরাজ্যে মুসলমানরা এবং সমাজে ইসলামোফোবিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে।

ইসলামোফোবিয়া সচেতনতা মাস 2012 সালে সহ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম এনগেজমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (মেন্ড) এবং ইসলামফোবিক ঘৃণামূলক অপরাধের দ্বারা সৃষ্ট বিপদকে তুলে ধরার জন্য নিবেদিত।

2024 সালের মার্চে শেষ হওয়া হোম অফিসের তথ্য দেখায় যে পুলিশের দ্বারা নথিভুক্ত করা ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধের 38% মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল। যুক্তরাজ্যের 70%-এরও বেশি তরুণ মুসলিম যারা বলে যে তারা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য লড়াই করছেন; তারা ইসলামফোবিয়ার শিকার হয়েছেন বলেও জানান। মসজিদের 42% গত 3 বছরে ধর্মীয়ভাবে অনুপ্রাণিত আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে এবং এর মধ্যে 83% বছরে অন্তত একবার আক্রমণ করেছে।

ইসলামোফোবিয়া বর্ণবাদের মধ্যে নিহিত এবং এটি এক ধরনের বর্ণবাদ যা মুসলিমত্ব বা অনুভূত মুসলিমত্বের অভিব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। এই সচেতনতা মাস আমাদের ইসলামোফোবিয়া মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করে।

*মানসিক স্বাস্থ্য:

ইসলামোফোবিয়া বিষণ্নতা, উদ্বেগ, পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, কম আত্মসম্মানবোধ এবং মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা সহ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির একটি পরিসরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ইসলামোফোবিক ঘটনাগুলির অনির্দেশ্যতা হাইপারভিজিল্যান্সের অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

যারা এই ধরনের মনোভাব, শব্দ এবং কর্মের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারা মানসিক এবং আবেগগতভাবে, সেইসাথে শারীরিক এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

*শারীরিক স্বাস্থ্য:

ইসলামোফোবিয়া উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ মাত্রার সি-রিঅ্যাকটিভ প্রোটিন, করোনারি আর্টারি ক্যালসিফিকেশন, এবং একটি অস্বাস্থ্যকর খাদ্য সহ বিভিন্ন শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায় বৃহত্তর জনসংখ্যার তুলনায় স্বাস্থ্য বৈষম্যের একটি পরিসীমা অনুভব করে।

50 বছর বা তার বেশি বয়সী মুসলমানদের 24% খারাপ বা খুব খারাপ স্বাস্থ্যের রিপোর্ট করা হয়েছে যা জাতীয় গড়ের দ্বিগুণ।

বিপুল সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায়ও বঞ্চিত এলাকায় বাস করে, যা স্বাস্থ্য ও সুস্থতাকে প্রভাবিত করে।

*স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস:

ইসলামোফোবিয়া প্রসূতি যত্ন সহ স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস হ্রাস করতে পারে এবং কম স্বাস্থ্যসেবা-সন্ধানী আচরণ করতে পারে। মুসলিম রোগীরাও ধর্মীয় পোশাক পরা সহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে বৈষম্যের সম্মুখীন হতে পারে।

মুসলিম রোগীদের বরখাস্ত হওয়ার এবং ভুল নির্ণয়ের সম্ভাবনা বেশি, এটি রিপোর্ট করা হয়েছে যে উদ্বেগগুলিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয় না এবং ফলস্বরূপ সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় তাদের জন্য দ্রুতগতিতে বেশি। মুসলিম নারীরা মাতৃত্বে প্রবেশের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের সম্মুখীন হয় এবং তরুণ ব্রিটিশ মুসলমানরা ক্লিনিকাল কুসংস্কার এবং সাংস্কৃতিক কলঙ্কের শিকার হয়।

*উন্নয়নমূলক সুস্থতা:

প্রতিকূল শৈশব অভিজ্ঞতা যে কোনো ব্যক্তির ভবিষ্যত স্বাস্থ্য এবং সুস্থতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। হয়রানি এবং বর্ণবাদের প্রাথমিক সংস্পর্শে মুসলিম বাচ্চাদের উন্নয়নমূলক মঙ্গলকে প্রভাবিত করে।

*আসুন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে কিছু মন্তব্য দেখে নেই এই প্রসঙ্গেঃ

*মন্তব্য – ১

"একজন আমাকে বলেছেন, তিনি একটি শপিং মল এ প্রথমে একটি সম্পূর্ণ আবৃত ( চশমার জন্য চোখও দেখা যাচ্ছে না ) বোরকা পরিহত নারীকে দেখে এবং কিছুক্ষনের মধ্যেই আরবী পোষাক পরিহিত কয়েকটি দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে একসাথে হাঁটতে দেখে দ্রুত ওই মল ত্যাগ করেছেন । (সম্ভাব্য বোমা হামলার ভয়ে) । আপনার বিবেচনায় ওই ব্যক্তি কি ইসলামোফোবিক? মানুষ দেখে উনার মধ্যে ভয় কাজ করেছে । মল এ দাঁড়িয়ে থেকে সত্যি বোমা ফাটে কিনা দেখাটা কি উচিত হতো? আমার তো তাকে বুদ্ধিমান মনে হয়েছে"।

"একটি শপিং মল, একটি বা দুটি মুখঢাকা নারী আর কয়েকটি তালেবানি চেহারার লোককে একসাথে দেখলে লোকটি আবারও ভয় পাবে, বারবার ভয় পাবে এতে সন্দেহ নেই । ক্রনিক ব্যাপার হবে সেটা । কিন্তু মানসিক রোগ হবে কি? সেই একই ব্যক্তি তো আক্রান্ত বলাও কি সুবিচার হবে? সাধারন চেহারা পোষাকের মুসলিম নারী পুরুষকে দেখে ভয় পান না । বন্ধু বলে জড়িয়েও ধরতে পারেন । একসাথে মল-এও যেতেপারেন । লোকটাকে ফোবিয়ায় আক্রান্ত বলা যাবে কি"?

*মন্তব্য – ২

“ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তাকে ইসলামোফোব বলা হচ্ছে , সেই সংগে ত্যানাবাজী করা হচ্ছে যে যৌক্তিক সমালোচনা না করে যা ইচ্ছা বলা হচ্ছে। কেউ অযৌক্তিক সমালোচনা করলে পারলে তাকে যুক্তি দিয়ে বলুন কিন্তু ইসলামোফোব বলে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করবেন না”।

*মন্তব্য – ৩

*রাজনৈতিক ইসলাম নিজে অতীতমুখী, সর্বাত্মকবাদী, ‘ইসলামো-ফ্যাসিস্ট’ রাষ্ট্রের ধারনা লালন করে বলেই তার বিরোধীদের ‘ইসলামোফোবিক’ বলে আখ্যায়িত করে। এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শব্দ, যা মৌলবাদ সচেতনভাবে তৈরি করে এবং ব্যবহার করে। এমনই অপর একটি শব্দ, যা হিন্দু মৌলবাদ ব্যবহার করে, সেটি হল ‘লাভ জিহাদ’।

মুক্তচিন্তার সংগ্রামে লিপ্ত মানুষেরা যত বেশী এই শব্দগুলো ব্যবহার করবে, ততই এইসব উদ্দেশ্যমুলক শব্দগুলো বৈধতা পাবে। তাই সচেতনভাবেই এইসব শব্দের ব্যবহার বন্ধ করা বাঞ্ছনীয়”।

*মন্তব্য – ৪

“ইসলামোফোবিয়া” শব্দটা ইসলামিস্টদের বহুল ব্যবহৃত একটি টার্ম। এই শব্দটাকে এরা এতদিন ধরে ব্র্যান্ডিং করছে তাদের অপকর্মের সমালোচনাকে প্রতিহত করার ঢাল হিসাবে। সেই একই দায়িত্ব এখন কাঁধে তুলে নিয়েছেন এতদিন আমরা যাদের সমমনা মনে করেছি তাঁরা। অতি মানবতাবাদী আমাদের এই বন্ধুগণ রাজনৈতিক ইসলামের সমালোচনাকে ইদানিং ইসলামফোবিয়া বলে যখন মনে করে তখন একটু কষ্ট লাগে”।

এই চারটি মন্তব্য যারা করেছেন, তাঁরা সকলেই প্রগতিশীল, অগ্রসর চিন্তার মানুষ। বলাই বাহূল্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কোনও মন্তব্য নিশ্চিত ভাবেই সেই

মানুষটির চিন্তার সম্পূর্ণ প্রতিফলন নয়। অনেক সময়েই এই সকল মন্তব্যগুলো খুব তড়িৎ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ, সুচিন্তিত মতামত নাও হতে পারে। তাই এই মন্তব্যগুলোকে কেবল তাঁদের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া বলেই ধরে নিচ্ছি এবং নামহীন হিসাবে উল্লেখ করছি। তারপরেও, এই মন্তব্যগুলো থেকে "ইসলামোফোবিয়া" সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়াটা খানিকটা বোঝা যায়। একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে – "ইসলামোফোবিয়া" কি ব্যক্তির ইসলামভিতী বা মুসলিমভীতি? যেভাবে প্রথম মন্তব্যটিতে প্রকাশ করা হয়েছে, তালিবানী পোশাকে কাউকে দেখে যদি কোনও একজন মানুষ বোমা আতংকে ভোগেন তাকে কি "ইসলামোফোবিক" বলা হবে? সোজা উত্তর হচ্ছে, সমাজবিজ্ঞানের চত্বরে "ইসলামোফোবিয়া" বলে যে ধারণাটির আলোচনা – বিতর্ক চলছে, তার অর্থ এই ধরনের ব্যক্তিগত আতংকের বিষয় নয়। দুনিয়ার যেকোনো কিছু দেখে একজন ব্যক্তি সুখ – দুঃখ – আনন্দ – বেদনা – হর্ষ – আতংক বোধ করতে পারেন এমন কি তা প্রকাশও করতে পারেন। অর্থাৎ কোনও একটা ভীতিকর কিছু দেখে কেউ যদি সিদ্ধান্ত নেন "শপিং মল" ত্যাগ করার, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীন অধিকার, এর সাথে আলোচ্য "ইসলামোফোবিয়া" ধারণাটির সম্পর্ক একদমই নেই তা বলা যাবেনা, তবে সম্পর্কটি দূরতম। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – একজন অগ্রসর চিন্তার মানুষ কেনো এই বহুল আলোচিত শব্দটি বা ধারণাটি নিয়ে এই রকমের প্রাথমিক ও বিভ্রান্তিকর ধারণা নিয়ে বসে আছেন? এর কারণ আছে। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ধারণার জন্ম দিচ্ছেন আমাদের মুক্তচিন্তক দাবীদার লেখকদেরই কেউ কেউ, তাঁদের লেখালেখির মধ্য দিয়ে। একটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি –

"মনে করেন আপনি বিমানে করে যাচ্ছেন। আপনার পাশে বা পিছনে এক টুপি দাড়ি পাগরি পরা মুসলমান সুরমা চোখে তসবি জপছে আর মাঝে মাঝে মৃদু স্বরে আল্লাহো আকবর বলছে... আপনি ভীত হলেন আপনার সহযাত্রীর উদ্দেশ্য নিয়ে। সে কি বোমা মারবে নাকি ছিনতাই করবে বিমান এই আশংকায় আপনি তটস্থ থাকলেন।... মোটা দাগে এটাই ইসলামফোবিয়া। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওই রকম ধার্মীক মুসলমান যাত্রী বিমানে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে না তবে বিগত বিশ বছরের যত ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ তার সবই কোন না কোন ধর্মীয় মুসলমানের হাতেই। ঢাকার রমনাতে যে বছর বোমা ফুটল, এরপর থেকে টুপি দাড়িওয়ালা মাদ্রাসার ছাত্র কিসিমের কেউ মেলায়, এক্সিবিশনে, জনসভায় এসে দাঁড়ালে মানুষ চোরা চোখে চাইত। নিরাপত্তা গেইটে এই

লেবাসের লোকজনকে বেশি করে তল্লাসি চালাতো। এখনো খোলা কোন জায়গায় গানের অনুষ্ঠানের আশেপাশে হুজুর লেবাসের লোকজনকে মানুষ আলাদা দৃষ্টিতে দেখে। এটাই হচ্ছে ইসলামফোবিয়া"।

"বাইরের দেশের কথা বাদ দেন, ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে আপনি কোন রেলস্টেশনে কি বিমানবন্দরে চিৎকার করে নারায়ে তাগবির আল্লাহো আকবর বলেই জোড়ে একটা দৌড় লাগান ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে, দেখবেন আশেপাশের মানুষ ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। এই ইসলামফোবিয়া নেচারাল। এর পিছনে ইসলাম এবং মুসলমানরাই দায়ী"।

সুষুপ্ত পাঠক আমাদের বাংলা ভাষাভাষী ব্লগ চত্বরে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। মুক্তচিন্তক দাবীদার এই লেখক নিরন্তর ভাবে লিখে চলেছেন, ধর্মীয় মৌলবাদ এর বিরুদ্ধে, ইসলামী সন্ত্রাসবাদ এবং বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ইসলামের ভয়াবহ উত্থানের নানান দিক নিয়ে তিনি আমাদের আলোকিত করে চলেছেন। শুধু মুক্তমনা পাঠকদের মাঝেই নন, তিনি বিরাট সাধারণ পাঠকের মাঝেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তচিন্তার সংগ্রাম সুষুপ্ত পাঠকের কাছে ঋণী। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি হচ্ছে, "ইসলামোফোবিয়া" বিষয়ে সুষুপ্ত পাঠকের যে ধারণা তিনি এখানে প্রকাশ করেছে, তা ভয়াবহ রকম প্রাথমিক, বিভ্রান্তিকর, অযথাযথ ও বালখিল্য। এবং আমাদের উদাহরনের প্রথম মন্তব্যটি লক্ষ্য করে দেখুন, তা আসলে ইসলামোফোবিয়া বিষয়ে সুষুপ্ত পাঠকের চিন্তারই একটা সহজ সরল প্রকাশ।

"ইসলামোফোবিয়া" সঠিক না বেঠিক, উচিৎ বা অনুচিত, বাস্তব না অবাস্তব, ভালো না মন্দ, মহান নাকি খল এই সকল কিছু নিয়েই বিতর্ক করা যেতে পারে। কিন্তু প্রথম বিষয়টি পরিস্কার করে নেয়া দরকার, "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটি দিয়ে যে সামাজিক প্রপঞ্চ (Social phenomenon) গুলোকে বোঝানো হয়ে থাকে, তা সুষুপ্ত পাঠকের এই ধরনের ব্যাখা থেকে যথেষ্ট জটিল এবং দূরের। সুষুপ্ত পাঠকের "ইসলামোফোবিয়া" বিষয়ক বোঝাপড়ায় সরলীকরণ আছে, কিন্তু তিনি যে বিষয়টিকে বোঝেননা তা নয়, তিনি বোঝেন, তার লক্ষণ তাঁর লেখায় আছে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো এই লেখাতেই।

সুষুপ্ত পাঠক ও আরো অনেক মুক্তচিন্তক বন্ধুদের সাথে আমার চলমান বিতর্কের একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে, সামাজিক প্রপঞ্চ গুলোকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অনেক তরুন পাঠকদের মতো এই সকল সিজনড ব্লগার বন্ধুদেরো রয়েছে অতি সরলীকৃত পদ্ধতি (Oversimplified approach)। এই লেখার বিষয়টি অর্থাৎ "ইসলামোফোবিয়া" নিয়েও তাইই ঘটেছে।

বরং পরবর্তী তিনটি মন্তব্যের প্রতিটিতেই কিছু কিছু বাস্তবতার উল্লেখ আছে। যেমন ধরুন, দ্বিতীয় মন্তব্যে একজন বন্ধু লিখেছেন –

"ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তাকে ইসলামোফোব বলা হচ্ছে , সেই সংগে ত্যানাবাজী করা হচ্ছে যে যৌক্তিক সমালোচনা না করে যা ইচ্ছা বলা হচ্ছে"।

এটা বাস্তব। পশ্চিমা বিশ্ব এবং বিশেষত ইউরোপের বাস্তবতায়, মুসলমান সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ, ইসলাম সম্পর্কে সমালোচনা এমন কি অত্যন্ত গঠনমূলক সমালোচনাকেও "ইসলামোফোবিক" বলে উল্লেখ করছেন। মুসলিম মোল্লাতন্ত্র ইসলামের সমালোচনা বন্ধ করার জন্যেও এই শব্দটিকে ব্যবহার করছেন। এই বিষয়েও আলোচনা উল্লেখ করবো এই লেখায়।

তৃতীয় মন্তব্যটি শুরুই হয়েছে একটি বিশেষ শব্দ "রাজনৈতিক ইসলাম" দিয়ে। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে "রাজনৈতিক ইসলাম"কে একটি সাম্প্রতিক ধারণা বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যার সাথে রয়েছে বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক ও ভু-রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল। "ইসলামোফোবিয়া"র আলোচনায় তাই রাজনৈতিক ইসলামই অধিক প্রাসঙ্গিক, ইসলামের চাইতে। যদিও, ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, রাজনৈতিক ইসলাম আসলে ইসলামেরই এক বর্ধিত সংস্করণ।

শেষ দুটি মন্তব্যের মূল বক্তব্য হচ্ছে "ইসলামোফোবিয়া" হচ্ছে ইসলামিস্টদের আবিষ্কার এবং এটা একটা চতুর উদ্দেশ্য প্রনোদিত শব্দ, যা আসলে ইসলামিস্টদের উদ্দেশ্যকেই সেবা করে। অন্তত ঐতিহাসিক তথ্য আমাদেরকে বলেনা যে এই শব্দটি ইসলামিস্টদের

আবিষ্কার এমন কি পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায়, একাডেমিক লেখালেখি – গবেষণায় এই বিষয় নিয়ে যে বিপুল পরিমানে লেখালেখি রয়েছে তার প্রায় অধিকাংশই পশ্চিমা ও অমুসলিম মানুষদের হাতেই গড়ে উঠেছে। তবে "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটি কাদের উদ্দেশ্য সাধন করে সেটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। এটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

এবারে মূল আলোচনায় প্রবেশ করি।

*ইসলামোফোবিয়াঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত:

বিনয়ের সাথে বলি, যারা বলেন "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটি ইসলামিস্টদের আবিষ্কার তাঁরা ভুল বলেন। তাঁদের এই তথ্য বা উপসংহার ইতিহাসনিষ্ঠ নয়। অন্তত সমাজবিজ্ঞানের লিখিত ইতিহাস বলছে ভিন্ন কিছু। লিখিত ইতিহাস বলছে – শব্দটির উৎস হিসাবে খুঁজে পাওয়া যায় একটি ফরাসী শব্দ "Islamophobie" যার আক্ষরিক অর্থ করা যেতে পারে ইসলাম সম্পর্কে মন্দ মানসিকতা বা ইসলাম বিষয়ে শত্রুভাবাপন্ন। এই অর্থে, আজকের "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটির সাথে ধারণাটির এর অর্থগত ও ব্যবহারিক পার্থক্য আছে, যা নীচের ব্যাখ্যায় পরিস্কার হবে বলে আশা করছি।

ফরাসী উপনিবেশিক শাসক জনাব Alain Quellien কে মনে করা হয় প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি লিখিত দলিলে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলে। মূলত ফরাসী উপনিবেশিক শাসকদের একটি আমলাতান্ত্রিক দলিলে তিনি এই ধারণাটির ব্যাখ্যা করেন (The Muslim Policy in West Africa, 1910)। পশ্চিম আফ্রিকায় ফরাসী কলোনিগুলোতে যে সকল উপনিবেশিক প্রশাসকরা কাজ করতেন, মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝানোর জন্যেই তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। খৃস্টানদের তুলনায় মুসলিমদের শাসন করা সহজ, এর কারণ হিসাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, ধর্ম হিসাবে ইসলাম খ্রিস্টান ধর্মের চাইতে সহজ এবং জটিলতাবিহীন। পিছিয়ে থাকা মুসলমান জনগোষ্ঠী উপনিবেশিক শাসকদের জন্যে খৃস্টানদের চাইতে অধিক সহজে শাসনযোগ্য (easy to rule) । তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন,কেনো মুসলিম জনগোষ্ঠীতে ইউরোপীয় কলোনি বিস্তার সহজতর। সেজন্যেই তিনি অন্যান্য

উপনিবেশিক শাসকদের আহ্বান করেছিলেন মুসলমানদের আদিম, বর্বর, ভয়াবহ ইত্যাদি "ইসলামোফোবিক" ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে।

আরেকজন উপনিবেশিক প্রশাসক Maurice Delafosse, প্রায় একই সময়ে "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটি ব্যাখ্যা করেনা। তিনিও একই ভাবে বলেছিলেন, উপনিবেশিক প্রশাসনের ভেতরে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণাবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এবং প্রশাসন নীতিগত ভাবেই মুসলমানদের প্রতি ঘৃণাবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন, যাকে তিনি মনে করেছিলেন অপ্রয়োজনীয় এবং ফরাসী কলোনি বিস্তারের জন্যে প্রতিবন্ধক। তিনি লিখেছিলেন, ইসলামোফোবিয়া তাই ফরাসী সরকার তথা উপনিবেশিক শাসকদের উদ্দেশ্য সাধন করেনা (Does not serve the purpose of west)।

পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে প্যালেস্টাইনী বংশোদ্ভূত আমেরিকান লেখক এডওয়ার্ড সাঈদ এই শব্দটি ব্যবহার করেন তাঁর লেখায়। সম্ভবত তিনিই প্রথম একাডেমিক জার্নাল এ এই শব্দটি ব্যবহার করেন। এডওয়ার্ড সাঈদ কে নিয়েও ব্যাপক বিতর্ক আছে আমাদের মুক্তচিন্তক ও নাস্তিক বন্ধুদের মাঝে। জন্মগত ভাবে এডওয়ার্ড সাঈদ একজন আরব খৃস্টান, তিনি জন্মেছিলেন প্যালেস্টাইনে কিন্তু সারাজীবন কাটিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর পিতা একজন আমেরিকান সৈনিক, আমেরিকার হয়ে যুদ্ধ করেছেন। সাঈদ পড়াশুনা করেছেন স্ট্যানফোরড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন বামপন্থী চিন্তা প্রভাবিত মানুষ। আন্তোনীয় গ্রামশি, মিশেল ফুকো কিম্বা পোষ্ট মডারনিস্ট তাত্ত্বিক থিওডোর আডোরনো'র বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবের কারণে, এডওয়ার্ড সাঈদ ছিলেন পশ্চিমের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচক। অর্থাৎ সকল অর্থেই তিনি একজন আমেরিকান অথবা কোনও অর্থেই তাঁকে "ইসলামিস্ট" বলার সুযোগ নেই। সুতরাং এই অর্থেও উপসংহার টানা যায়না যে "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটি ইসলামিস্ট দের আবিষ্কার বা বানানো।

উৎপত্তির দিক থেকে একমাত্র মুসলিম সংশ্লিষ্টতা পাওয়া ১৯১৮ সালের সময় কালে একজন ফরাসী পেইন্টার বা চিত্রকর Etienne Dinet যিনি পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে। তিনি ও তার আলজেরিয়ান সহকর্মী দুজনে মিলে

মুহাম্মদের জীবনী অনুবাদ করেন যেখানে তিনি ফরাসী ভাষায় ইসলামোফবিয়ার সমার্থক একটি শব্দ ব্যবহার করেন, যার শাব্দিক অর্থ ইসলামকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নীচু করে দেখানো।

এই হচ্ছে নিরেট ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে দেখলে ইসলামোফোবিয়া শব্দটির ইতিহাস। যদিও শব্দটির উৎস নিয়ে এই ইতিহাস এখন আর খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, এই প্রাথমিক লেখকেরা ঠিক যে অর্থে বা যে ধারনাকে প্রকাশ করার জন্যে এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, ইসলামোফোবিয়া শব্দটির বর্তমান অর্থ আরো অনেক বেশী বিস্তৃত এবং সেই অর্থে রাজনৈতিক ভাবে অনেক খানিই ভিন্ন। সুতরাং শব্দটির সাম্প্রতিক ইতিহাসটিই বেশী প্রাসংগিক আর সেজন্যে আমাদের কে শব্দটিকে বিশ্লেষণ করতে হবে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে।

"রানিমেইড ট্রাস্ট" – "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটির পুনর্জন্ম যার হাত ধরে।

উপরে উল্লেখিত এই সকল উৎসই আসলে আধুনিক কালে বা সাম্প্রতিক সময়ে "ইসলামোফোবিয়া" বলতে আমরা যা বুঝি তাঁর সাথে আক্ষরিক অর্থে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং বর্তমান সময়ের "ইসলামোফোবিয়া" ধারণাটিকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে পরিচিত করে তোলে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠান "রানিমেইড ট্রাস্ট"। রানিমেইড ট্রাস্ট যুক্তরাজ্যের প্রথম সারির একটি থিংক ট্যাংক, যারা বর্ণবাদ বিরোধী গবেষণা করে থাকে এবং সরকার ও পাবলিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে তাঁদের নীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। যে সকল পাঠকের আগ্রহ আছে, তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটির ওয়েব সাইট ঘুরে দেখতে পারেন (রানিমেইড ট্রাস্ট )। যুক্তরাজ্যের এই মূল ধারার থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠানটিকে আর যাই বলা হোক না কেনো অন্তত ইসলামী বা মুসলিমদের প্রতিষ্ঠান বলার কোনও সুযোগ নেই। ১৯৯৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি আঠারো সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে যার প্রধান ছিলেন অধ্যাপক গরডন কনওয়ে। এই আঠারো সদস্যের কমিটিতে ধর্মীয় পরিচয়ের দিক থেকে মুসলিম, খৃস্টান, হিন্দু, শিখ এবং ইহুদী সকলেই ছিলেন। এই কমিটি যে রিপোর্টকটি প্রকাশ করেন তাঁর শিরোনাম ছিলো – "Islamophobia a Challenge For Us All"। রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই মিডিয়া ও অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

রিপোর্টটিকে স্বাগত জানিয়ে এবং এর বিরোধিতা করে পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনা – সমালোচনা সৃষ্টি হয়।

রানিমেইড ট্রাস্ট এর এই রিপোর্টটির প্রায় বিশ বছর পরে আরেকটি ফলো-আপ রিপোর্ট প্রকাশ করে "Islamophobia – still a challenge to us all" শিরোনামে। ফলো-আপ রিপোর্টটির শিরোনামে বোঝা যায়, অন্তত রানিমেইড ট্রাস্ট মনে করছে, এই সমস্যাটি এখনও আমাদের সবার জন্যে একটা চ্যালেঞ্জ।

এবারে দেখা যায়, রানিমেইড ট্রাস্ট ইসলামোফোবিয়া বিষয়টিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং এর সাথে যুক্ত অর্থবহতার সমস্যাকে কিভাবে উল্লেখ করেছে। বোঝার সুবিধার জন্যে, আমি সরাসরি ইংরাজি ভাষাতেই হুবুহু তুলে দিচ্ছি রানিমেইড ট্রাস্ট এর রিপোর্ট টি থেকে (সাথে আমার করা বাংলা অনুবাদ ও দিচ্ছি যদি কিছু পাঠকের সুবিধা হয় তাতে।) ঃ

"The term Islamophobia refers to unfounded hostility towards Islam. It refers also to the practical consequences of such hostility in unfair discrimination against Muslim individuals and communities, and to the exclusion of Muslims from the mainstream political and social affairs".

(অনুবাদঃ "ইসলামোফোবিয়া শব্দটি ইসলামের প্রতি অদৃশ্যমান শত্রুতা বা শত্রুভাবাপন্নতা কে নির্দেশ করে। এটা আরো নির্দেশ করে এই ধরনের শত্রুভাবাপন্নতার কারণে মুসলমান ব্যক্তি ও সম্প্রদায় যে অন্যায্য বৈষম্যের স্বীকার হন এবং তাতে যদি মুসলমান নাগরিকদের মূলধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে ভিন্ন করে দেয়া হয়"।)

উপরের ইংরাজিতে দেয়া এই সংজ্ঞাটিকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় রিপোর্টটিতে। যেখানে এই সংজ্ঞা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে।

“The original Islamophobia report states that the term refers to three phenomena

• Unfounded hostility towards Islam;

• Practical consequences of such hostility in unfair discrimination against Muslim individuals and communities;

• Exclusion of Muslims from mainstream political and social affairs”

We mainly agree with this broad definition. In our view, the focus should be on the second and third phenomena.

(“আসল ইসলামোফোবিয়া রিপোর্ট এ শব্দটি সম্পর্কে তিনটি প্রপঞ্চকে উল্লেখ করেছিলোঃ

• ইসলামের প্রতি অদৃশ্যমান বিদ্বেষ

• এই বিদ্বেষ থেকে বাস্তবজীবনে মুসলমান ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মানুষেরা যদি অন্যায্য বৈষম্যের স্বীকার হন এবং

• এর ফলে যদি তাঁরা মূলধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন

আমরা মূলত এই সংজ্ঞাটির সাথে একমত পোষণ করি, তবে আমাদের মতে মূল বিষয় হিসাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পয়েন্টটিতেই বেশী জোর দেয়া উচিৎ”।)

বিষয়টি খুব পরিস্কার। ইসলাম বা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের ফলে যদি মুসলিম ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে বৈষম্যের স্বীকার হতে হয়, মূলধারার রাজনীতি ও সামাজিক সংগঠনগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়, সেটাই ইসলামোফোবিয়া”।)

সুতরাং এটা পরিস্কার যারা শুধুমাত্র “ফোবিয়া” শব্দটিকে টেনে এনে বলার চেষ্টা করেন, এই জন্যে মুসলমানেরা দায়ী তাঁরা হয় এই বিষয়টি নিয়ে ন্যূনতম পড়াশুনা করেন নি অথবা তাঁরা বিষয়টি অন্যদের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে অযথাযথ ব্যাখ্যা প্রচার করছেন। বিষয়টি কেবল “ফোবিয়া” নয়, “ফোবিয়া” থেকে উৎসারিত ঘৃণা ও ঘৃণার চর্চা। এটা আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো নীচের বর্ণনায়।

এখন প্রশ্ন হলো, কেনো হঠাত করে এই নতুন শব্দটির দরকার হয়ে পড়লো। অথবা কেনো হঠাত করে এই অপ্রচলিত, আপাতভাবে অর্থহীনতায় আক্রান্ত, খানিকটা বিভ্রান্তিকর শব্দের পুনপ্রচলন দরকার হয়ে পড়লো? এই নতুন শব্দটির অধিক প্রচলন কি সমাজের জন্যে কোনও উপকার বয়ে নিয়ে আসবে? সেই ব্যাখ্যাও রানিমেইড ট্রাস্ট এর রিপোর্ট এ উল্লেখ করা হয়েছে। মূল রিপোর্ট থেকেই তুলে দিচ্ছি এখানেঃ

“The word ‘Islamophobia’ has been coined because there is a new reality which needs naming: anti-muslim prejudices has grown so considerably and so rapidly in recent years that a new item in the vocabulary is needed so that it can be identified and acted against. In a similar way there was a time in European history when a new word, antisemitism, was needed and coined to highlight the growing dangers of anti-jewish hostility. The coining of a new word, and with it the identification of a growing danger, did not in that instance avert eventual tragedy. By the same token, the mere use of the new word ‘Islamophobia’ will not in itself prevent tragic conflict and waste. But, we believe, it can play a valuable part in the long run endeavor of correcting perceptions and relationships”.

(অনুবাদঃ “ইসলামোফোবিয়া শব্দটির প্রচলন হয়েছে কারণ একটি নতুন বাস্তবতার প্রেক্ষিত তৈরী হয়েছে যার একটি নাম দরকার। মুসলিম বিদ্বেষ এবং মুসলিমদের প্রতি সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তার ঘটেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে এবং সাম্প্রতিক সময়ে এর বিস্তার এতোটাই দ্রুত হারে হচ্ছে যে এর একটি নাম দরকার যেনো এই ধরনের

ঘটনাকে কে চিহ্নিত করা যায় ও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। প্রায় একইভাবে ইউরোপের ইতিহাসে একটি সময় ছিলো যখন একটি নতুন শব্দের দরকার হয়ে পড়েছিলো সেই সময়ে ইহুদীবিদ্বেষের ভয়াবহতাকে প্রকাশ করার জন্যে।কেবল মাত্র একটি শব্দের প্রচলন এবং তার দ্বারা সেই সকল বিদ্দেশের ঘটনাকে চিহ্নিত করাটাই এই সকল ঘটনার করুণ পরিনতিকে দূর করতে পারেনি। একই ভাবে, কেবল "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটির প্রচলনই সমাজ থেকে এই সমস্যাগুলো দূর করতে পারবেনা। কিন্তু আমরা আশা করি, এটা হয়তো দীর্ঘমেয়াদে মানুষের ধারণার বদল ঘটাতে ও মানুষে মানুষে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে"।)

অন্তত উদ্দেশ্যের দিক থেকে বোঝা যায় যে এই শব্দটির প্রচলন এক ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায্য আচরণের বিরুদ্ধেই, যা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে অযাচিত ঘৃণা ও বঞ্চনার হাত থেকে সুরক্ষা দিয়ে সমাজের মূলধারায় যথাযথ অংশগ্রহনকে নিশ্চিত করে। সুতরাং এই শব্দটির উৎপত্তি ও প্রচলনের সাথে অন্তত উদ্দেশ্যের দিক থেকে কোনও ভাবেই ইস্লামিস্ট দের "পারপাস সারভ" করার বা ইসলামিস্টদের উদ্দেশ্য সাধনের কোনও যৌক্তিকতা নেই। শুধুমাত্র এই ধরনের ঘতনাগুলোর শিকার একটি বিশেষ ধর্মের মানুষ বলেই সেটা ইসলামিস্টদের পারপাস সারভ করবে, তা যৌক্তিক নয়। এমন কি যদি ইসলামিস্টরা এই শব্দটিকে তাদের মতো করে ব্যবহার করেন, সেটা হবে দুর্ভাগ্যজনক এবং সচেতন নাগরিক সম্প্রদায়ের উচিৎ হবে তার বিরুদ্ধেও সজাগ সংগ্রাম জারী রাখা।

"ইসলামোফোবিয়া" শব্দটির সমালোচনা

এবারে দেখা যাক, "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটির সমালোচনা প্রসঙ্গে। শব্দটির সমালোচনার কয়েকটি মাত্রা বা ডাইমেনশন রয়েছে। প্রথমত – শব্দটির শাব্দিক অর্থ নিয়ে সমালোচনা, সেই অর্থে অনেকেই মনে করেন শব্দটি তার আভিধানিক অর্থ যা এবং শব্দটি যা বোঝাতে চায়, তার মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে। অর্থাৎ শব্দটিকে যদি নিরেট শাব্দিক অর্থে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় ইসলামের প্রতি অযৌক্তিক ভীতি বা ইসলামজনিত অযৌক্তিক ভীতি, কেননা "Phobia" শব্দটির অর্থ হচ্ছে irrational fear বা অযৌক্তিক ভীতি।

শব্দটি নিয়ে সমালোচনার আরেকটি মাত্রা হচ্ছে, এই শব্দটি ইসলাম সম্পর্কে যৌক্তিক আলোচনা বা সমালোচনার পথ রুদ্ধ করতে পারে। অর্থাৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী বা ইসলামিস্ট রা এই শব্দটিকে ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে ইসলামের যৌক্তিক সমালোচনাকে রুদ্ধ করতে পারে এবং যারা ইসলামের যৌক্তিক সমালোচনা করেন তাঁদেরকে ইসলামোফোব বা ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করতে পারে।

"ইসলামোফোবিয়া" শব্দটি নিয়ে তৃতীয় সমালোচনা টি হচ্ছে, আদৌ কি একটি নতুন শব্দের প্রয়োজন রয়েছে? মুসলিম সমাজের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বে কি সত্যিই এই ধরণের আচরণের ভয়াবহতা এতোটাই যে এই ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্যে একটি নতুন আলাদা শব্দের দরকার?

শব্দটি সম্পর্কে এই সকল সমালোচনারই বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। সেজন্যেই রানিমেইড ট্রাস্ট এর রিপোর্ট এর শুরুতেই স্বীকার করা হয়েছে এই শব্দটি তাদের আবিষ্কার নয়। বরং এই শব্দটি অনেক আগে থেকেই সমাজে প্রচলিত এবং মুসলিমদের একটি অংশ এই শব্দটি তাদের প্রতি যে ঘৃণা ও বৈষম্যমূলক আচরণের ঘটনা ঘটছে চারপাশে তা বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করে থাকেন। প্রথম রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছে – "ইসলামোফোবিয়া" শব্দটি নিখুত বা পারফেক্ট নয়। হয়তো মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা সূচক আচরণের প্রকাশ হিসাবে "এন্টি-মুসলিম" বা "মুসলিমফোবিয়া" ধরনের কোনও শব্দের কাছাকাছি। কিন্তু তাঁরা উল্লেখ করেছেন, অর্থের দিক থেকে ইসলামোফোবিয়া শব্দটি ইংরাজি "জেনোফোবিয়া" বা "ইউরোফোবিয়া" ধরনের একটি শব্দ। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, এই প্রবনতাটি হচ্ছে ধর্ম হিসাবে ইসলামের প্রতি ভীতি বা ঘৃণা থেকে উতসারিৎ তীব্র ঘৃণা বা অপছন্দ প্রকাশ করার ঘটনাটিই হচ্ছে "ইসলামোফোবিয়া" আর এর প্রধান এবং একমাত্র টার্গেট মুসলিম জনগোষ্ঠী। সুতরাং যারা মনে করেন, ইসলামী পোষাক পরিহিত মানুষের থেকে ভীত হওয়াটাই "ইসলামোফোবিয়া" তাঁরা ভুল বলেন। বরং এই ভীতি থেকে উৎসারিত দীর্ঘমেয়াদী "ঘৃণা" এবং এই ঘৃণা জনিত কারণে যদি মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষমূলক বৈষম্য করা হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে "ইসলামোফোবিয়া"। এই ভীতি থেকে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বা অধিকাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি "ঘৃণাবাচক" আচরণ প্রকাশ

করাই হচ্ছে “ইসলামোফোবিয়া”। সুতরাং শব্দটিকে কেবল একটি শব্দ হিসাবে নেয়ার চাইতে এটিকে একটি ধারণা হিসাবে নেয়াটাই যৌক্তিক।

যেমন ধরা যাক ইংরাজি “Homophobia” শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হয়তো হবে সমকামী মানুষদের প্রতি অযৌক্তিক ভীতি, কিন্তু বাস্তবে শব্দটি কেবল সমকামী মানুষদের প্রতি ভীতিকেই প্রকাশ করেনা বরং সমকামী মানুষদের প্রতি আমাদের সমাজে বহু বছর ধরে চলে আসা অন্যায্য সংস্কার, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতাকেই প্রকাশ করে। এমন কি শুধু বিদ্বেষ বা শত্রুভাবাপন্নতাই নয়, সমকামী মানুষদের প্রতি সামাজিক বয়কট, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিশেধাজ্ঞার মতো বিষয়কেও সমাজ প্রশ্রয় দিয়েছে বছরের পর বছরে বিনা প্রশ্নে। সমকামী মানুষদের প্রতি এই সামাজিক ঘৃণা সুপ্রাচীন গ্রীক সমাজে খ্রিষ্টের জন্মেরও ছয়শো থেকে আটশো বছরের আগের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। অথচ এই শব্দটি প্রথম চালু করেন রবার্ট ওয়েইনবারগ নামের একজন সাইকোলজিস্ট ১৯৬০ সালে আর এই টার্মটি প্রথম একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৬৯ সালে একটি জার্নাল আরটিকেল এর মাধ্যমে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে ১৯৯৫ সালের আগে কোনও আমেরিকান রাষ্ট্রপতি এই ধারণাটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকার করেন নি। রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন হচ্ছেন প্রথম রাষ্ট্রপতি যিনি এই শব্দটি উচ্চারন করেন এবং স্বীকার করেন মার্কিন সমাজে তীব্র ভাবেই হোমোফোবিয়া রয়েছে। তাহলে এতো হাজার বছরের একটি সমস্যাকে ডাকার জন্যে কেনো একটি আলাদা নাম বা Homophobia শব্দটির  দরকার হলো? কারণ, যেকোনো সমস্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার প্রথম শর্ত হচ্ছে সেই সমস্যাটির অস্তিত্বকে স্বীকার করা। আর সমস্যাটিকে চিহ্নিত করার জন্যে তার একটি নাম দরকার, সংজ্ঞা দরকার। তাহলে সেই নামে, সেই সংজ্ঞা দিয়ে সমাজে সমস্যাটির পরিমান নির্ধারণ করা যায় এবং তাকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, কমিয়ে আনার জন্যে নীতিগত ব্যবস্থা নেয়া যায়।

ইসলামোফোবিয়া নিয়ে এই রিপোর্ট টি তৈরী করতে গিয়ে রানিমেইড ট্রাস্ট ব্রিটিশ সমাজের অনেকের ইন্টারভিউ করেছেন। ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সাক্ষাৎকার কে ভিত্তি করে মুসলিম সমাজের প্রতি পশ্চিমা এবং ব্রিটেনের খৃস্টানদের মতামতের একটা সারসংখেপ করেছেন তারা। ব্রিটেনের মুসলিম নাগরিকদের উপরে শারীরিক

আক্রমনের কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করেছেন। এমন কি বর্ণবাদী হামলায় নিহত মুসলিম ভিকটিমদের ঘটনাগুলোও পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাদের রিপোর্টটি চুড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করার আগে প্রায় ৩৫০০ নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানকে পাঠানো হয়েছিলো তাদের মতামতের জন্যে। প্রায় শ'দেড়েক দীর্ঘ মতামত পাওয়া যায় এই বিভিন্ন নাগরিক, পেশাগত প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের কাছ থেকে। বেশীর ভাগ মতামতই (রানিমেইড ট্রাস্ট এর হিসাব অনুযায়ী ৯০% এর অধিক) ছিলো এই রিপোর্টটির পক্ষে এবং এর প্রতি সদর্থক। সবশেষে, রানিমেইড ট্রাস্ট তাদের ধারণা কে এইভাবে প্রকাশ করেছেন –

"It is possible therefore to describe 'Islamophobia' as an umbrella term incorporating criminal behaviour, open hostility and bigotry and prejudice aimed at Muslim or Islamic targets".

(অনুবাদঃ তাই এটা সম্ভব, ইসলামোফোবিয়া শব্দটিকে একটি বিস্তৃত ধারণা হিসাবে ব্যবহার করা যার অন্তর্গত থাকতে পারে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রকাশ্য বিদ্বেষমূলক আচরণ, অপরাধ মূলক আচরণ, গোড়ামী ও সংস্কারাচ্ছন্ন আচরণ।)

ইসলামের সমালোচনা কি ইসলামোফোবিয়া?

এর সোজাসাপটা উত্তর হচ্ছে- না, ইসলামের সমালোচনা করাটা ইসলামোফোবিয়া নয়। বরং ইসলামের সকল ধারণার চুলচেরা সমালোচনা করাটা যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকের অধিকার। আজকের আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে ইসলামের অনেক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথার সরাসরি সংঘর্ষ রয়েছে। উদারনৈতিক গনতাৎন্ত্রিক মানুষ তাই ইসলামের সেই সকল বিষয়ের সমালোচনা করেন। এক্টিভিস্ট নাস্তিকেরা অন্যান্য ধর্মের মতোই ইসলামের সকল মৌলিক প্রতিপাদ্যকে চ্যালেঞ্জ করেন। মানুষ হিসাবে ইসলামের নবী মুহাম্মদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সেসবের নৈতিক বোঝাপড়াকে চ্যালেঞ্জ করেন। এই সবই যেকোনো গণতান্ত্রিক সমাজের নাগরিকের মৌলিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে। পশ্চিমের, বিশেষত ইউরোপে বাক-স্বাধীনতার যে ঐতিহ্য রয়েছে, তাতে ইসলাম সহ সকল ধর্মের সমালোচনা করা খুব স্বাভাবিক চর্চা। এটা

ইসলামোফোবিয়া নয়। আসুন দেখা যাক, রানিমেইড ট্রাস্ট এর রিপোর্টটিতে এ বিষয়ে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সরাসরি তুলে দিচ্ছি সেখান থেকেঃ

“It is not intrinsically phobic or prejudiced, offcourse, to disagree with or to disapprove of muslim beliefs, laws or practices. Adherents of other world faiths disagree with Muslims on points of theology and religious practice. By the same token agnostics and secular humanists disagree with Muslims, as with all religious believers on basic issues. In a liberal democracy it is inevitable and healthy that people will criticize and oppose, sometimes robustly, opinions and practices with which they disagree. It can be legitimate to criticize policies and practices of Muslim states and regimes, for example especially when their governments do not subscribe to internationally recognized human rights, freedoms and democratic procedures, or to criticize and condemn terrorist movements which claim to be motivated by Islamic values. Similarly it can be legitimate to criticize the treatment of women in some Muslim countries, or the views and attitudes which some muslims have towards “the west”, or towards other world faith. Debates, arguments and disagreements on all these issues take place just as much amongst Muslims, it is important to recognize, as between Muslims and non-Muslims. “

(অনুবাদঃ “মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস কিম্বা ইসলামী আইন ও বিভিন্ন চর্চার সাথে দ্বিমত পোষণ করা বা দ্বিমত করা অবশ্যই সংস্কারাচ্ছন্নতা বা ভীতি নয়। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের মানুষ মুসলমানদের সাথে ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে ও ধর্মীয় চর্চার দিক থেকে ভিন্নমত পোষণ করে থাকে। একই ভাবে অজ্ঞেয়বাদী কিম্বা সেকুলার মানবতাবাদীরা অন্যান্য সব ধর্মের বিরোধিতার মতো করে ইসলামেরও বিরোধিতা করেন। একটি উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক দেশে এটা গণতান্ত্রিক চর্চার একটি অপরিহার্য অংশ যে

জনগন তার দ্বিমতের কথা প্রকাশ করবে, তাদের মতামত জানাবে। ইসলামী দেশগুলো বা ইসলামিক শাসকদের সমালোচনাও খুবই যৌক্তিক যখন সেই দেশ বা শাসকগোষ্ঠী তাদের নিজেদের দেশে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা করেনা কিম্বা সারা বিশ্বে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করাও যৌক্তিক। একই ভাবে কিছু ইসলামী দেশ যেভাবে নারীরদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন করে তার সমালোচনা করা যেতে পারে কিম্বা মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতি বা অন্যান্য ধর্মের প্রতি যে আচরণ করে থাকে তারও সমালোচনা করা যেতে পারে। এই সকল বিতর্ক, যুক্তি-পাল্টা যুক্তি কিম্বা দ্বিমত শুধু মুসলমানদের ভেতরেই নয়, মুসলমান দের সাথে অমুসলিম জনগনের মাঝেও হতে পারে"।)

সুতরাং সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বাংলাদেশে যে নব-নাস্তিকতার ধারা চালু হয়েছে, সেই ধারায় ইসলামের যে চুলচেরা বিশ্লেষণ আমরা দেখছি সেই সকল আলোচনা – সমালোচনা কখনই ইসলামোফোবিয়া নয়। আমাদের নব-নাস্তিকতাবাদী আলোচনার চত্বরে ইসলামের যে কমন বা সাধারণ বিষয়গুলো সবচাইতে বেশী আলোচিত হয় তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া যেতে পারে এখানে –

*১ – আল্লাহর একত্ববাদকে চ্যালেঞ্জ করা ও এর ভন্ডামী উন্মোচন করা

*২ – মুহাম্মদের নবুয়ত যে ভাওতাবাজী ছিলো তা নিয়ে আলোচনা করা

*৩ – কুরআন যে একটি অসংলগ্ন পুস্তক, যা মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও সহিংসতা ছড়ায় সে বিষয়ে আলোচনা করা

*৪ – মুহাম্মদ যে একজন যুদ্ধবাদী নেতা ছিলেন এবং সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের জন্যে তিনি বাধ্য করতেন বিভিন্ন গোত্রকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে

*৫ – মুহাম্মদের অনৈতিক যৌনাচার ও নারীর প্রতি মুহাম্মদের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবহার

এই ধরণের বেশকিছু বিষয় নিয়েই আমাদের নব-নাস্তিকতাবাদী লেখকদের মূল আলোচনাগুলো আমরা দেখতে পাই। বলাই বাহুল্য এই সকল বিষয় নিয়ে যৌক্তিক আলোচনা, লেখালেখি কখনই ইসলামোফোবিয়া নয়। যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশেই এই বিষয়গুলো নিয়ে মত প্রকাশ করা, লেখালেখি করা নাগরিকের মৌলিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে। সুতরাং ইসলামোফোবিয়ার সংজ্ঞাগত দিক থেকে ইসলামের সমালোচনাকে বাতিল করেনা। তাহলে মোটের উপরে ইসলামোফোবিয়া কি?

ইসলামোফোবিয়া হচ্ছে, আপনার ইসলাম বিরোধিতা যদি আপনার মাঝে কিম্বা আপনার পাঠক, সহযোগী নাগরিকদের মাঝে দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণার জন্ম দেয় এবং সেই ঘৃণা থেকে যদি পদ্ধতিগত ভাবে একটি বিশেষ গোষ্ঠী মুসলিম সম্প্রদায়কে বৈষম্যমূলক ভাবে আলাদা করতে শেখায়, মূলধারার রাজনীতি, সংস্কৃতি কিম্বা সামাজিক কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাইই হচ্ছে ইসলামোফোবিয়া। রানিমেইড ট্রাস্ট এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, ইসলামোফোবিয়া তে মুসলিমদের মাঝে চার ধরণের পরিনতি বা কনসিকোইয়েন্স দেখা যায় –

এই হচ্ছে সংক্ষেপে রানিমেইড ট্রাস্ট এর দেয়া “ইসলামোফোবিয়া”র সংজ্ঞা। সচেতন পাঠকের অনুধাবনের জন্যে।

উপরের এই চিত্রটিতে যে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, এসবই হচ্ছে ইসলামোফোবিয়ার মূল লক্ষণ। অর্থাৎ আমাদের আচরনে, সামাজিক অনুশীলনে, সামাজিক – রাজনৈতিক – অর্থনৈতিক জীবনে যদি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বৈষম্য করা হয়, তাদেরকে যদি প্রকাশ্যে বা গোপনে, সামাজিক ভাবে যদি এড়িয়ে চলা বা বয়কট করা হয়, যদি তাদের প্রতি সংস্কারাচ্ছন্ন আচরণ করা হয় কিম্বা তাদের প্রতি যদি শারীরিক ভায়লেন্স বা আক্রমন করা হয়, এই ধরণের ঘটনা গুলোকে ইসলামোফোবিয়া বলা হবে। সুস্পষ্ট ভাবেই দেখা যাচ্ছে, এখানে ইসলামের সমালোচনা করা যাবে কি যাবেনা সেই ধরণের কোনও মাত্রা নেই।

বলাই বাহূল্য, মুসলমানেরা প্রায়শই সুযোগ নিয়ে থাকেন “ইসলামোফোবিয়া” শব্দটির, তা দিয়ে ইসলামের সমালোচনা কে ঠ্যাকানোর জন্যে। সেটাও আজকের সময়ের চ্যালেঞ্জ, ইসলামোফোবিয়া বিষয়ে সত্যিকারের ধারণা না থাকলে, মুসলিমদের এই শঠতাকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে কিভাবে?

মানবতাবাদী মানুষেরা ঘৃণার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। যেকোনো ধরণের সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। শুনতে হয়তো খুব তাত্ত্বিক শোনাবে, তবুও বলা দরকার মানবিক মানুষের মানবিকতা বা মানবতাবোধ ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী দেখে নির্ধারিত হয়না। তাই ইসলামোফোবিয়া বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। এটার নৈতিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। মানবিক মানুষদের মাঝে আলোচনা – বিতর্ক সবসময়েই সদর্থক। এই লেখাটি সেই আলোচনা বা বিতর্কের সুত্রপাত করুক বাংলা ভাষায়, সেটাই আমার প্রত্যাশা।

## ***অধ্যায় -৪

***কুরআনের দলিল (সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০:৮):
***لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ***

"আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না তাদের সঙ্গে সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে, যারা ধর্মের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।"

***হাদিস (সুনান আবু দাউদ):
***أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ***

"সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের (মু'আহাদ) প্রতি জুলুম করবে, তার অধিকার হরণ করবে, তাকে তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপাবে, অথবা তার সন্তুষ্টি ছাড়া তার কোনো কিছু গ্রহণ করবে—কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে বাদী হব"।

***ভূ-রাজনীতি ও বৈশ্বিক ফলাফল (Global Consequences):

*মানবাধিকারের অবক্ষয় (Erosion of Human Rights)মূল সংকট:

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের (War on Terror) নামে বিশ্বজুড়ে মৌলিক নাগরিক অধিকার ও আইনি সুরক্ষা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বাস্তব উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্রের 'প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট' (Patriot Act) পাসের মাধ্যমে বিনা পরোয়ানায় নজরদারি এবং মুসলিম নাগরিকদের গণ-নজরদারির (Mass

Surveillance) আওতায় আনা।কেস স্টাডি: গুয়ান্তানামো বে (Guantanamo Bay) ডিটেনশন ক্যাম্প। যেখানে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে শত শত মুসলিম পুরুষকে চার্জশিট বা বিচার ছাড়াই বছরের পর বছর আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে।

*পরিসংখ্যান:

Watson Institute (Brown University)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৯/১১ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের 'নো-ফ্লাই লিস্ট' (No-Fly List) এবং বিশেষ নজরদারির তালিকায় অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে ৯০%-এরও বেশি মুসলিম নামধারী।বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা (Global Instability)মূল সংকট: মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে পশ্চিমা সামরিক হস্তক্ষেপ এবং শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের (Regime Change) চেষ্টা ওইসব অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে।বাস্তব উদাহরণ: ২০০৩ সালের ইরাক আক্রমণ এবং ২০১১ সালের লিবিয়া হস্তক্ষেপ, যা রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়।

**মানবিক ফলাফল:

এর ফলে তৈরি হওয়া নজিরবিহীন শরণার্থী সংকট (Syrian & Iraqi Refugee Crisis), যা পরবর্তীতে ইউরোপে চরম ডানপন্থী এবং ইসলামোফোবিক রাজনীতির উত্থান ঘটায়।পরিসংখ্যান: UNHCR-এর তথ্যমতে, বৈশ্বিক শরণার্থীর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ সিরিয়া, আফগানিস্তান এবং সোমালিয়ার মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিক।উগ্রবাদের চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি (The Vicious Cycle of Extremism)মূল সংকট: প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক ইসলামভীতি উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর জন্য একটি নিখুঁত 'রিক্রুটমেন্ট টুল' বা সদস্য সংগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

**কার্যপ্রণালী:

পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিমদের প্রান্তিকীকরণ, মসজিদে হামলা এবং বৈষম্যকে পুঁজি করে উগ্রপন্থীরা প্রচার করে যে—"পশ্চিমারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।"কেস স্টাডি: ক্রাইস্টচার্চ মসজিদ হামলা (২০১৯)। শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ব্রেন্টন ট্যারেন্ট নিউজিল্যান্ডের

দুটি মসজিদে ৫১ জন মুসলিমকে হত্যা করে, যা বিশ্বজুড়ে মুসলিম তরুণদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে। উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলো এই ক্ষোভকে তাদের প্রচারণায় ব্যবহার করে।পরিসংখ্যান: Pew Research Center-এর জরিপ অনুসারে, পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাসকারী তরুণ মুসলিমদের একটি বড় অংশ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং পরিচয়ের সংকটে ভোগে, যা তাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।বহুপাক্ষিকতাবাদের সংকট (Crisis of Multilateralism)মূল সংকট: জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক আদালতগুলোর (ICJ/ICC) দ্বিমুখী নীতি বিশ্বস্ততার সংকট তৈরি করেছে। পশ্চিমা স্বার্থ বনাম মুসলিম দেশের মানবাধিকার রক্ষায় স্পষ্ট বৈষম্য দৃশ্যমান।বাস্তব উদাহরণ: ফিলিস্তিন বা কাশ্মীরের মতো দীর্ঘস্থায়ী সংকটে জাতিসংঘের রেজুলেশন বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার।

এশিয়া মহাদেশকে সভ্যতার পাদপীঠ বা সূতিকাগার বলা যায়। অর্থনৈতিকভাবে, জ্ঞানবিজ্ঞানে ও ঐতিহাসিকভাবে এশিয়ায় ভারতের অবস্থান যেখানেই থাক না কেন, চলমান বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তথা ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারত গুরুতপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিশেষত ভারতের শতকোটি জনসংখ্যা, বিশ্বব্যাপী এর বিশাল ডায়াসপোরা এবং হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি, বৃটিশ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও গণতান্ত্রিক সংবিধানের কারণে বিশ্ব পরিমন্ডলে ভারতের একটা বাড়তি গুরুত্ব রয়েছে। ভারতের শাসকরা কি সে গুরুত্ব এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন? স্বাধীনতার সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতারা যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশটিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পৃক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা ছিল চিরায়ত ভারতের অনিবার্য বাস্তবতা। হিন্দুত্ববাদীদের চরম মুসলমান বিদ্বেষ এবং রক্তাক্ত দাঙ্গার কারণে ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের জন্ম হলেও এখনো ভারতে বিশ্বের একক বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই মুসলমানরাই ভারতের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ করেছে এবং জীবন দিয়েছে। হাজার বছর আগে অবিভক্ত ভারত নামে কোনো একক রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্ব ছিল না। তুরস্ক, আফগানিস্তান ও পারস্য থেকে আসা মুসলমান দিগি¦জয়ী সুলতান ও মুঘল বাদশারাই শতধাবিভক্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে সালতানাত ও মুঘল সা¤্রাজ্যের পত্তন ঘটিয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপ-আমেরিকার কাছে ভারত নামক রাষ্ট্র ও তার জনমানুষের পরিচয় গবেষণামূলক তথ্য-উপাত্তসহ যে

ব্যক্তি প্রথম তুলে ধরেছিলেন তার নাম আল বেরুনি। তার ভারততত্ত্¡ই বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত সম্পর্কিত প্রথম পুর্ণাঙ্গ আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতের শিল্পায়ন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে মুসলমানরাই পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল। মূলত হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও সম্মিলন ছাড়া ভারতের অগ্রযাত্রা ও বিকাশ কল্পনা করা যায় না। আজকের ভারতের হিন্দুত্ববাদী মুসলিম বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ভারতের ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রার বিপ্রতীব অবস্থানে ঘুরপাক খাচ্ছে। শত শত বছরের সুলতানি ও মুঘল শাসনের ধারাবাহিকতায় দুইশ বছরের বৃটিশ শাসনে ভারত থেকে ইউরোপে সম্পদের পাচার ও লুণ্ঠনের মচ্ছব ঘটলেও ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির বৃটিশ শাসনও ভারতকে এতটা দেউলিয়া ও অন্ত:সারশূন্য করে দিতে পারেনি, যতটা ঔপনিবেশোত্তর ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি এবং মাত্র দেড়-দুই দশকের হিন্দুত্ববাদী শাসনে আজ ভারত ভেতর থেকে বিপর্যস্ত ও আক্রান্ত হয়েছে।

আল্লামা ইকবাল লিখেছিলেন, সারা জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা। ভারতের প্রতিটি মুসলমান এখনো এভাবেই ভাবতে অভ্যস্থ। ভারত স্বাধীনতা লাভের প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে কবি ইকবাল এই কবিতা লিখেছিলেন। এটি এখনো ভারতের অন্যতম জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত। ১৯০৪ সালের ১৬ আগস্ট ইত্তেহাদ পত্রিকায় তারানায়ে হিন্দ নামে পরিচিত ‘সারা জাঁহাসে আচ্ছা’ কবিতা প্রকাশিত হওয়ার এক বছর পর ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকার ভারতের পূর্বাংশের যোগাযোগ ও প্রশাসনিক অবকাঠামোগতভাবে অনুন্নত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার উন্নয়ন ও প্রশাসনিক সেবা সহজ করতে ঢাকাকে রাজধানী করে বাংলার পূর্বাংশ ত্রিপুরা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে নিয়ে একটা নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেছিল। এই উদ্যোগের পেছনে একদিকে যেমন পিছিয়ে পড়া বাঙ্গালি মুসলমানের বড় স্বার্থ নিহিত ছিল, সেই সাথে এখানকার অবকাঠামো উন্নয়ন, রেললাইন সম্প্রসারণ, পাটকল স্থাপনসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহের সাথে বৃটিশদের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের স্বার্থও জড়িত ছিল। তবে ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী এবং কোর্ট-কাচারি স্থাপিত হলে কলকাতার গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রবাহে ভাটা পড়বে, বেনিয়া আইনজীবী ও জমিদারদের স্বার্থহানি ঘটবে সম্ভবত এমন আশঙ্কাকে সামনে রেখেই কলকাতা কেন্দ্রিক রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও কবি-সাহিত্যিকরা একাট্টা হয়ে বাংলাভাগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে

তুলেছিলেন। সেই আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গমায়ের অঙ্গচ্ছেদের বিরোধিতা করে 'আমারা সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গীতি কবিতাটি রচনা করেছিলেন। পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধ করে স্বাধীন হওয়ার পর সেই কবিতাকেই আমরা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। হিন্দুত্ববাদীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার ঢাকাকেন্দ্রীক পূর্ববাংলার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ রদ করে **১৯১১** সালে আবারো কলকাতার সাথে একীভূত করতে বাধ্য হয়েছিল। পূর্ববাংলার মুসলমানদের প্রত্যাশার আলো মাত্র ৫ বছরেই নিভে যায়। হতাশ ও বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের দাবির প্রেক্ষিতে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করেছিল কলকাতার বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকরা। সেই আন্দোলনেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মুখসারিতে দেখা গেছে। তবে চল্লিশের দশকের নতুন বাস্তবতায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কলকাতায় মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং দেশভাগের প্রেক্ষাপটে কলকাতার বাবুদের রূপ আমূল পাল্টে গিয়েছিল। তাদের অনেকের মূল দাবি ছিল, আর কিছু ভাগ হোক বা না হোক, বাংলা ভাগ হতেই হবে! লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো গণভোট বা জনমত অনুসারে, স্বাধীন অথবা ভারত ও পাকিস্তানের যেকোনো একটি ইউনিয়নে যোগ দিতে পারবে। সে হিসেবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ থাকলেও হিন্দুমুসলমানর ভেদাভেদের কারণে ঐতিহাসিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা ভুলে দুইভাগে ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তানে যুক্ত হয়েছিল। দুই বাংলা একীভূত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হলে সেটি হয়তো উপমহাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে ওঠার সমুহ সম্ভাবনা ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ লেখক-ইতিহাসবিদ লর্ড অ্যাক্টন লিখেছিলেন, 'পাওয়ার টেন্ডস টু করাপ্ট, অ্যাবসুলিউট পাওয়ার করাপ্টস অ্যাবসুলিউটলি।' আর অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে দার্শনিক ভলতেয়ার লিখেছিলেন, 'গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রিসপন্সিবিলিটিজ।' ইতিহাসের বড় বড় ঔপনিবেশিক সা¤্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদী শক্তি তাদের সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে একেকটি সা¤্রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তির পতন ঘটেছিল। উসমানীয় খেলাফত, মুঘল সা¤্রাজ্য, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি

থেকে শুরু করে মার্কিন সা¤্রাজ্যবাদের উত্থান-পতনের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্য বেরিয়ে আসে। কট্টর জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমের আস্ফালন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ফ্যাসিবাদে পরিনত করতে পারে। গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে জার্মানীতে হিটলারের নাজি পার্টির উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা কিভাবে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইউরোপসহ পুরো বিশ্বকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। রাষ্ট্রশক্তি যদি জনমতের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রত্যাশাকে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে বিভক্ত করে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে চায় তা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের সম্ভাবনাকে শেষ করে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডিং ফাদাররা যেসব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে এসে সেসব বিষয়গুলো মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তির উপর আঘাত হানতে শুরু করেছিল। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং সিস্টেম ও কারেন্সি নিয়ন্ত্রণের মত বিষয়গুলো মার্কিন জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার যে আশঙ্কা ফাউন্ডিং ফাদাররা করেছিলেন, তা এখন বাস্তব রূপে আবির্ভূত হয়েছে। কর্পোরেট পুঁজিবাদ মার্কিন জনগণকে দেউলিয়া করে গুটি কতেক ব্যক্তি ও পরিবার সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। অর্থনৈতিক মহামন্দায় শেয়ার বাজার ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সম্পদ হারিয়ে, বাড়িঘর ও চাকরি হারিয়ে এখন হাজার হাজার মার্কিন নাগরিককে ‘উই আর ৯৯%’ প্ল্যাকার্ড নিয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়। অর্থনৈতিক কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বঞ্চনার ঢেউ বিশ্বের দেশে দেশে বহুমাত্রিক সংকট সৃষ্টি করেছে। অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বহুজাতিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো দেশে দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত বিভাজন ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিভাজনকে উগ্রতার দিকে উস্কে দিতে নেপথ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করেছে। বিশেষত শতকোটি মানুষের বড় দেশ ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে কমিউনিটিতে ও প্রতিবেশিদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে শাসকদের দুর্বল অবস্থানে ঠেলে দিয়ে স্বার্থ হাসিলের তৎপরতা চলছে কি না তা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও বিশেষজ্ঞরাই ভাল বলতে পারবেন।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া স্বাধীন রাষ্ট্র ইউক্রেন এখন রাশিয়ার সাথে ন্যাটোভুক্ত ইউরোপ-আমেরিকার দ্বন্দ্বের ‘অ্যাপল অব ডিসকর্ড’ হয়ে উঠেছে। যেকোনো সময় ভয়াবহ যুদ্ধের আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভারতীয় উপমহাদেশে রাশিয়া বা পশ্চিমাদের তেমন কোনো নিবিড় ভূ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ না থাকলেও এখানে ভারত ও চীনের মত পারমানবিক পরাশক্তির যুদ্ধ-সংঘাত এবং নীরব লড়াইয়ের চলমান ইতিহাস রয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক কারণে এই দুই শক্তির পশ্চাতে আমেরিকা ও রাশিয়ার নেপথ্য ইন্ধন থাকা খুবই স্বাভাবিক। একই বাস্তবতায় ইউরোপের ইউক্রেনের মত উপমহাদেশের রাজনীতিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার গুরুত্বপূর্ণ। নিরীহ অসামরিক রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর মিয়ানমার বাহিনীর গণহত্যা ও জাতিগত নির্মূল অভিযান চালিয়ে ইতিহাসের ঘৃণ্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরও ভারত, চীন বা পশ্চিমাদের নীরব ভূমিকার নেপথ্যেও মিয়ানমানের খনিজসম্পদের উপর তাদের লোলুপ দৃষ্টি ও গোপণ সমঝোতার আভাস অনেকটাই স্পষ্ট। এখন বাংলাদেশের ভবিষ্যত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে চীন-মার্কিন কূটনৈতিক রশি টানাটানি তেমন জোরালো হয়ে না উঠলেও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাবেক ও বর্তমান শীর্ষ ৭ কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত গার্মেন্টস ক্রেতারা বাংলাদেশি রফতানিকারকদের ঋণপত্রের উপর নতুন শর্ত আরোপ করতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক কারণে পারস্পরিক দ্ব›দ্ব-সংঘাত, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অত:পর বহুজাতিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বার্থান্বেষী মহলের দাবার গুটি হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টির ভুরি ভুরি উদাহরণ সাম্প্রতিক ইতিহাসে রয়েছে। মিলিটারি ইন্ডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্সের স্বার্থে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কর্পোরেট জায়নবাদের ক্রীড়নকে পরিনত হয়ে ওয়ার অন টেররিজমের নামে মধ্যপ্রাচ্যে একের পর এক দেশ দখল ও প্রক্সি ওয়ারের মাধ্যমে মার্কিন জনগণের রাজস্ব থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার লোপাট করা হয়েছে। এসব যুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অর্জন ছাড়াই পরাজয়ের গøানি মাথায় নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক-আফগানিস্তান ও সিরিয়া ছাড়তে হয়েছে।

বাণিজ্য, জ্বালানি ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের বোঝাপড়ার নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে রাশিয়া-আমেরিকার মত রাজনৈতিক পরাশক্তি দেশগুলো গত ৭ দশক ধরে পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। তবে রাশিয়ার পাশের মধ্য এশিয়া বা আমেরিকার পাশে মেক্সিকো বা পানামা বা কানাডার সাথে কোনো উত্তেজনার কথা শোনা যায়না। যতক্ষণ না আরেক পরাশক্তি সেখানে হস্তক্ষেপ করছে ততক্ষণ বড় কোনো উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরী হয় না। দুই পরাশক্তির মাঝখানে জনগণের ঐক্যই কেবল বিজয়ের নিয়ামক হতে পারে। ষাটের দশকে কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আফগানিস্তান, সিরিয়া বা ইউক্রেনের চলমান বাস্তবতা থেকে এই সত্য বারবার প্রমানিত। তবে ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির যে ভূমিকা দেখা যাচ্ছে, তা আমাদের উপমহাদেশকে ইতিহাসের এক ভয়াবহ পরিনতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক, মানবাধিকার সংস্থা ও জেনোসাইড বিশেষজ্ঞরা ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুসলিম কাউন্সিল আয়োজিত অনলাইন সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্ষীয়ান মার্কিন অধ্যাপক ও গবেষক, আন্তর্জাতিক গণহত্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'জেনোসাইড ওয়াচে'র প্রতিষ্ঠাতা ড.গ্রেগরি স্ট্যান্টন ভারতের মুসলমানরা রুয়ান্ডার মত গণহত্যার শিকার হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে রুয়ান্ডায় গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার কয়েক বছর আগেই প্রফেসর স্ট্যান্টন সেই গণহত্যার ভবিষ্যদ্বানি করেছিলেন। ভারতের মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রফেসর স্ট্যান্টনের পিলে চমকানো ভবিষ্যদ্বানির পর এবার মার্কিন প্রফেসর এমিরেটাস, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বর্ষীয়ান দার্শনিক, সমাজত্বাত্তি¡ক নোয়ম চমস্কি বলেছেন, ভারত সরকার মুসলমানদেরকে বিশ্বের বৃহত্তম নিপীড়িত জনগোষ্ঠীতে পরিনত করেছে। তিনি কাশ্মিরের উপর ভারতের নির্মম দখলদারিত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এর সাথে ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলের দখলদারিত্বের তুলনা করেছেন। একই অনলাইন সেমিনারে ভারতীয় লেখক ও ওয়েস্টমিনিস্টার ইউনিভার্সিটির লেকচারার অন্নপূর্ণা মেনন বলেছেন, বিজেপি সরকার যেভাবে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাচ্ছে বিশ্বসম্প্রদায়ের উচিৎ সে দিকে নজর দেয়া। ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া এডভোকেসি ডিরেক্টর জন সিফটনের মতে, ভারতের সংবিধান লঙ্ঘন করে সেখানে সংখ্যালঘুদের দমন করে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মীয় পক্ষপাত অনেক বড় হুমকি। এই হুমকি একদিকে যেমন ভারতের ২৫ কোটির

বেশি মুসলমানের প্রতি, ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রতি, অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশগুলোর নাগরিকদের প্রতিও।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিজেপি রাতারাতি পাল্টে দিয়ে ভারতের মুসলমানদের উপর হিন্দুত্বের দীক্ষা চাপিয়ে দিতে চাইছে। পশ্চিমাদের উপর জায়নবাদীদের চাপিয়ে দেয়া ইসলামোফোবিয়া ভারতে স্থান পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, ভারতের মুসলমানরা হাজার বছর ধরে ভারত শাসন করেছে এবং ভারতের জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ভারতেই জায়নবাদী প্রপাগান্ডায় ছড়িয়ে দেয়া ইসলামোফোবিয়া সবচেয়ে আক্রমনাত্মক (নোয়ম চমস্কির মতে, 'মোস্ট লিথ্যাল ফর্ম') রূপে আর্বিভুত হয়েছে! বিজেপি শাসিত কর্নাটকে শিক্ষাঙ্গনে মুসলমান নারীদের হিজাব পড়া নিষিদ্ধ করে সেখানকার মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার পন্থা বলে বিবেচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশসহ প্রতিবেশি দেশগুলোর উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। গতবছর ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া মাফলার পড়া একদল যুবক 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' 'বাংলাদেশ মুর্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা পায়ের নিচে ফেলে মাড়িয়ে অবমাননা করছে। ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে আপত্তির-ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য ও আক্রমণে বিক্ষুব্ধ হলেও বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় গোষ্ঠী ভারতের পতাকা নিয়ে এমন আচরণ করেনি। প্রতিবেশি বড় দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের উগ্রপন্থী কর্মীদের প্রতিবেশি দেশের প্রতি এমন বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ খুব খারাপ বার্তা বহন করছে। আমরা বিশ্বাস করি, ভারত একটি সুসভ্য মহান রাষ্ট্র আর সনাতন ধর্ম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন-অহিংস ধর্ম। জায়নবাদীদের সাথে যেমন জুদাইজমের পার্থক্য রয়েছে, তেমনি হিন্দুত্ববাদীরাও অহিংস হিন্দু নয়। অতএব হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বী বা ভারত রাষ্ট্রের প্রতি বাংলাদেশের মুসলমানদের কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। ভারতের হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাস শুধু ভারতকেই বিভাজন ও অশান্তির নিগড়ে নিক্ষেপ করছে না, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশিদের প্রতিও ক্রমাগত হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

**ফলাফল:

এই বৈষম্য আন্তর্জাতিক আইন ও বৈশ্বিক শান্তির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত করে দেয়।

ইসলামফোবিয়া (ইসলামভীতি) বৈশ্বিক রাজনীতি ও সমাজে গভীরভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এটি কেবল সামাজিক বৈষম্যই বাড়াচ্ছে না, বরং রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং সভ্যতার মধ্যকার দ্বন্দ্বকে উসকে দিচ্ছে। এর ফলে ভূ-রাজনীতি ও বিশ্বে বেশ কিছু সুদূরপ্রসারী ফলাফল পরিলক্ষিত হচ্ছে।

*১. ভূ-রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এবং সামরিক হস্তক্ষেপ: ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামোফোবিয়াকে পুঁজি করে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' (War on Terror) শুরু হয়। এর জেরে আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী সামরিক আগ্রাসন চালানো হয়, যা মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দেয় এবং লাখ লাখ মানুষকে উদ্বাস্তু করে।ক্ষমতার মেরুকরণ: পশ্চিমা বিশ্বে উগ্র ডানপন্থী ও রক্ষণশীল দলগুলো ইসলামফোবিয়াকে নির্বাচনী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এটি পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি করছে।আন্তর্জাতিক সংস্থায় উদ্বেগ: ইসলামোফোবিয়ার বৈশ্বিক প্রসার মোকাবিলায় ওআইসি (OIC)-এর মতো সংস্থাগুলোর উদ্যোগে জাতিসংঘের মাধ্যমে ১৫ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক ইসলামোফোবিয়া প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করতে হয়েছে, যা বৈশ্বিক উদ্বেগেরই প্রতিফলন।

*২. রাষ্ট্রীয় রাজনীতি ও সংখ্যালঘু নির্যাতনউগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান: বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় (যেমন: মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিপীড়ন এবং ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রসার) ইসলামোফোবিয়াকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্রহীন বা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।চীন ও উইঘুর সংকট: গ্লোবাল সাউথ বা পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে চীনে (উইঘুর মুসলিমদের দমন-পীড়ন) জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে ইসলামকে ভিন্নভাবে দেখার

প্রবণতা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা বৈশ্বিক মানবাধিকার রাজনীতিতে বড় সংকট তৈরি করেছে।

*৩. সামাজিক ও বৈশ্বিক ফলাফলঅভিবাসন ও শরণার্থী সংকট: যুদ্ধবিধ্বস্ত মুসলিম দেশগুলো থেকে পালিয়ে যাওয়া অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বে কঠোর নীতি ও সন্দেহের দৃষ্টি তৈরি হয়েছে। সীমান্ত নীতিতে কড়াকড়ি এবং অভিবাসন বিরোধী আইন বিশ্বজুড়ে মানবিক সংকট ঘনীভূত করেছে।ইসলামিক স্টেটের (আইএস) মতো উগ্রবাদের উত্থান: পশ্চিমা বিশ্বের আগ্রাসী নীতি এবং ইসলামোফোবিয়ার কারণে সৃষ্ট ক্ষোভ ও বঞ্চনাবোধকে কাজে লাগিয়ে উগ্রপন্থী দলগুলো বিশ্বব্যাপী তরুণদের মগজধোলাই করার সুযোগ পেয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজকে নানাভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈষম্য: কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মুসলিমদের বৈষম্য ও হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। হিজাব নিষিদ্ধকরণ বা মসজিদ নির্মাণে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা ইউরোপ ও আমেরিকার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

*৪. অর্থনৈতিক ও প্রচারণামূলক প্রভাবমিডিয়া ও প্রোপাগান্ডা: বৈশ্বিক গণমাধ্যম ও পপ কালচারে মুসলমানদের প্রায়শই ‘সন্ত্রাসী’ বা ‘সহিংস’ হিসেবে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়। এই মিথ্যা বয়ানগুলো ইসলামি সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ছড়ায়, যা বৈশ্বিক সম্প্রীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।সার্বিকভাবে, ইসলামফোবিয়ার প্রভাবে বিশ্বজুড়ে এক ধরণের বিভাজনের রাজনীতি তৈরি হয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধের নামে মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বাড়িয়েছে এবং বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## *** 🖉 উপসংহার ও উত্তরণের পথ (Conclusion and Solutions):

***সমাপনী কুরআন- (সূরা ফুসসিলাত ৪১:৩৪):

*وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*

"সৎকাজ ও অসৎকাজ সমান নয়। তুমি মন্দকে উত্তম দ্বারা প্রতিহত কর।"

**সমাপনী হাদিস -(সুনান তিরমিজি):

পূর্ণ হাদিসটি হলো:

*الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَٰنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ*

"দয়াশীলদের প্রতি পরম দয়ালু দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

***মূল্যবোধের পুনর্বিবেচনা (Rethinking Core Values)মূল বক্তব্য:

ইসলামোফোবিয়া কেবল মুসলিমদের সমস্যা নয়, এটি বৈশ্বিক মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য একটি বড় হুমকি।উত্তরণ: জাতিসংঘ কর্তৃক ১৫ই মার্চ-কে "আন্তর্জাতিক ইসলামোফোবিয়া মোকাবেলা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, তবে এর বাস্তব প্রয়োগ প্রয়োজন।পরিসংখ্যান: Gallup World Poll-এর তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ মানুষ মনে করে মুসলিম-পশ্চিমা সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি সবচেয়ে জরুরি।আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ (Legal & Institutional Measures)মূল বক্তব্য: বাক-স্বাধীনতার নামে ঘৃণা ছড়ানো (Hate Speech) এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য বন্ধে কঠোর আইনি কাঠামো তৈরি করতে হবে।কেস স্টাডি: ফ্রান্সে হিজাব ও আবায়া বিতর্ক। ধর্মনিরপেক্ষতার (Laïcité) দোহাই দিয়ে মুসলিম নারীদের পোশাকের

স্বাধীনতার ওপর নিষেধাজ্ঞা মূলত রাষ্ট্রীয় বৈষম্য।সমাধান: ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত (ECHR) এবং জাতীয় আইনগুলোতে "ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত অপরাধ" (Hate Crime)-এর সংজ্ঞা আরও স্পষ্ট ও কঠোর করা।শিক্ষা ও মিডিয়া সংস্কার (Educational & Media Reform)শিক্ষা: স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism) অন্তর্ভুক্ত করা এবং ইসলামের ইতিহাস ও অবদান সঠিকভাবে তুলে ধরা।মিডিয়া: হলিউড এবং মূলধারার সংবাদমাধ্যমে মুসলিমদের চিরচেনা "সন্ত্রাসী" বা "নিপীড়িত" রূপের বাইরে স্বাভাবিক ও ইতিবাচক উপস্থাপন নিশ্চিত করা।

পরিসংখ্যান: Georgetown University (The Bridge Initiative)-এর গবেষণা দেখায়, মূলধারার মিডিয়ায় মুসলিমদের নিয়ে নেতিবাচক সংবাদের হার ইতিবাচক সংবাদের তুলনায় প্রায় ৪ গুণ বেশি।আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (Interfaith Dialogue)মূল বক্তব্য ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে এবং জনমনে তৈরি হওয়া কাল্পনিক ভয় (Islamophobia) দূর করতে তৃণমূল পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

কার্যক্রম "Open Mosque Day" বা উন্মুক্ত মসজিদ দিবসের মতো উদ্যোগ, যেখানে অমুসলিমরা এসে সরাসরি ইসলাম ও মুসলিমদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পারে।ফলাফল: এটি সমাজের বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা ও যোগাযোগের শক্তিশালী সেতু তৈরি করে।